বাঙালী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশনী

সিটি কলেজ : : বাণিজ্য বিভাগ

কলকাতা

১৩৫৬ : ১৯৪৯

সাধারণ সম্পাদক ও প্রকাশক

অধ্যাপক লোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম্-এ

প্রকাশনী : সিটি কলেজ : বাণিজ্য বিভাগ

১৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট্

কলকাতা

মুদ্রক

দেবেন্দ্রনাথ বাগ

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস

২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

কলকাতা

প্রচ্ছদপট

মঞ্জুলা মিত্র

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা

চন্দ্রনাথ দে

মানচিত্র

দেবেন্দ্রনাথ কোলে

কমার্স্ মিউজিয়ম্

সিটি কলেজ : বাণিজ্য বিভাগ

ব্লক্-কারক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রক

বেংগল ফটোটাইপ্ কোং

৪৬।১ আম্‌হার্ষ্ট্ ষ্ট্রীট

কলকাতা

প্রথম মুদ্রণ

শ্রাবণ, ১৩৫৬

অগস্ট্, ১৯৪৯

মূল্য

দু' টাকা চার আনা

পিতার স্মৃতির

উদ্দেশে

বাঙালী

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

এই লেখকের অন্য বই

এখানে মৃত্যুর হাওয়া (সংকেত ভবন)
এক বছরের স্বাধীনতা (সিগ্নেট্ প্রেস্)

ইকনমিক্ জিয়োগ্রাফি
অফ্ ওয়েষ্ট্ বেংগল্
অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

প্র কা শ নী
সিটি কলেজ : বাণিজ্য বিভাগ

সূচী

সংশোধন

প্রধান ভুলগুলি এখানে শুধরে দেওয়া হল :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১	২৫	১৯৪১	১৯৫৩
৭২	২১	ক্রকস্	ক্রুক্
১১৯	২৩	আর গোটা	আর প্রায় গোটা

ভূমিকা

বাঙালীর মতো আর কোনো জাতি সমগ্র ভারতীয় জীবনকে উপলব্ধি করে অথচ নিজের একটা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এত গভীর ও ব্যাপক ভাবে সেই ভারতীয় জীবনকেই প্রভাবান্বিত করেছে বলে মনে হয় না। সেই বাঙালী আজ নানা কারণে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেও সংখ্যায় চেতনায় ও সাধনায় একটি সম্প্রদায় হিসাবে আজো ভারতে অগ্রগণ্য। সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই আলোচনার চেষ্টাই এই বইটিতে করা হয়েছে। এর উপাদান ও উপকরণ আগের লেখকদের রচনা থেকে নেওয়া, কিন্তু এর ব্যাখ্যা ও বিন্যাস নিজস্ব। স্বাধীনতার পরে বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগ থেকে ব্যাপক ও পরিকল্পিত ভাবে লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হওয়া উচিত।

এই বইয়ের রচনা সম্পর্কে সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী অধ্যাপকদের অনেকের কাছেই উৎসাহ ও উপদেশের জন্য কৃতজ্ঞ আছি। গ্রন্থপ্রকাশের জন্য সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল্ অরুণকুমার সেন এবং অধ্যাপক কেশবেশ্বর বসু ও অধ্যাপক লোকরঞ্জন দাশগুপ্তের উদ্দেশে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রচ্ছদপট ও মানচিত্রগুলির জন্য যথাক্রমে মঞ্জুলা মিত্র ও সিটি কলেজ কমার্স্ মিউজিয়মের দেবেন্দ্রনাথ কোলে-র কাছে ঋণী আছি।

অল্প সময়ের মধ্যে লেখা ও ছাপার জন্য যে ত্রুটি রইল তার জন্য পাঠকসাধারণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

১ : 'আমরা বাঙালী'

একটা আদর্শ-সংঘাত বা একটা যুগ-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জীবন-দর্শনের প্রকাশই হল মহাকাব্যের মূল কথা। রামায়ণের মধ্যে দেখি সেই বিরোধ, আর্যশক্তির সংগে অনার্যশক্তির মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এই বিরোধ চিরন্তন হয়নি, রক্তের দিক দিয়ে এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি মিশ্রণে ও সমন্বয়ে। রক্তের শুদ্ধতার গর্ব তাই আজ ভারতবাসী করতে পারে না, করবার প্রয়োজনও নেই। আর্য অনার্য দ্রাবিড় ও মোংগোল প্রভৃতি অনেক রকম রক্ত মিলেছে বাঙালীর দেহে, মনে এনেছে ব্যাপকতা। 'বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙালীরা এত সচেতন' (ব্রজেন্দ্রনাথ শীল)। এই রক্তমিশ্রণ বাঙালীকে দিয়েছে অনার্যের শিল্পকৌশল আর ভাবপ্রবণতা, আর্যের সংস্কৃতি আর তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, মিশ্রণের উদারতা। বাঙালীর নৃতত্ত্বে জাতি-সমন্বয়ের প্রাচুর্য তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রধান কারণ।

ইতিকথা

আর্য প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে পূর্বভারত প্রায় একরকম অস্পৃশ্য বলেই গণ্য হত। আর্যসভ্যতা যতো বিস্তৃত হতে লাগল ততোই আর্যবিরোধী পলাতকেরা সরে এল বাংলার দিকে। বাংলার আদিম অধিবাসীরা আর্য ছিল না, কিন্তু তাদের মানস স্বাতন্ত্র্য ছিল, একটা সভ্যতাও নিশ্চয় ছিল। পরাজিত মিশ্র অনার্যেরা ধীরে ধীরে আর্য সভ্যতা গ্রহণ করতে লাগল, ভাষাতেও প্রভাব দেখা গেল। কিন্তু

আজো দৈনিক জীবনের নানারকম আচার-ব্যবহারে অভ্যাস-অনুষ্ঠানে বাংলার আর্যবিরোধী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যেমন দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে।

বৈদিক সাহিত্যের নিষাদই হয়তো আদিম বাঙালী। কৃষি এদের প্রধান পেশা হলেও পাথর তামা ও লোহার ব্যবহার এরা জানত। এরাই এনেছে ধানের চাষ, জলসেচ, পর্বতগাত্রে ক্ষেত্রনির্মাণ, সমাজবিন্যাসে পঞ্চায়েত শাসন ও গ্রাম্যজীবনের সমূহতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতি। এদের কাছে আর্যেরা শিখেছিল অনেক লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্রের পদ্ধতি, সিঁদুর আর হলুদের ব্যবহার। বিতাড়িত অনার্য জাতিরা নতুন কৃষ্টির গোড়াপত্তন করেছিল। এদের মধ্যে অনেকে আর্যীকরণের যুগে উচ্চ পর্যায়ে উঠে গেল বোধ হয় শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয়ে, আর কেউ বা রইল অনুচ্চ শ্রেণীতে। আর্যদের দ্বারা অত্যাচারিত বহু জাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে খানিকটা প্রজাতন্ত্রমূলক এক গ্রাম্য সমাজ গড়ে তুলেছিল।

বাংলার মাটি, বাংলার জল

বাংলার কোমল মাটি যুগে যুগে বিদেশীকে আকর্ষণ করে এক পরিবর্তনশীল সমাজ সৃষ্টি করেছে; নতুন ভাবধারার প্রয়োজন তাই বাঙালীর জীবনে এতো বেশি হয়েছে। কিন্তু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ বিপ্লবের সৃষ্টি করলেও সংগঠনের দিক দিয়ে অনেক সময়ে ক্ষতিকর হয়েছে। ধৈর্য ও দৃঢ়তা তার কম। শ্যামল কোমল প্রকৃতি তাকে করেছে ভাববিলাসী; তাই মনোজগতে চিন্তার ক্ষেত্রে তার বৈশিষ্ট্য থাকবেই, কিন্তু কঠিন নীরস কর্মক্ষেত্রে তার পরাজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাঙালীর জীবনের সংগে তার দেশের নদীগুলির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। নদীর জল তাকে শুধু পরিপুষ্ট করেনি, গতিপরিবর্তনের

সংগে সংগে তার সমগ্র জীবনে বিপর্যয়ও এনে দিয়েছে। ভাগীরথী, সরস্বতী, যমুনা, পদ্মা, তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র – এসব নদীগুলির ও তাদের শাখার অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে নদীর ব-প্রদেশের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উত্থান-পতন। তাই যুগে যুগে বাংলার নদী বাংলাকে আর বাঙালীকে নতুন করে গড়েছে আর ভেঙেছে। কতো বর্ধিষ্ণু শহর, গ্রাম, বন্দর, লোকালয়, সমাজ ও কৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে, ইতিহাসের কতো অধ্যায় লুপ্ত হয়ে গেছে নদীর চরে, নদীর জলে, জংগলে আর মাটির তলায়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ভ্যান্ ডেন্ ব্রুকের মানচিত্র বা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে আইজ্যাক্ টিরিয়ানের মানচিত্রের সংগে বাংলার বর্তমান ছবি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে কী নিদারুণ নদী-বিপ্লব এ দেশে ঘটে গেছে। উত্তর ভারতে এ রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়নি, আর হয়নি বলেই সমাজ ও মনের দিক দিয়ে প্রভেদ রয়ে গেছে। নদীর মৃত্যু বা গতিপরিবর্তনের সংগে বাঙালীর সমাজ ও বাঙালীর মনের গূঢ় সম্পর্ক আছে। নদীই এনেছে অনেক সময়ে তার সমাজে প্রগতি, তার মনকে করেছে সচেতন ও দুঃসাহসী, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তার উদ্ভাবনী শক্তিকে প্রখর। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন :

> নদী যেখানে কীর্তিনাশা মানুষ সেখানে নিত্য নূতন কীর্তি অর্জন করে। তাই কোনো কীর্তিনাশা বাংলার নিজস্ব কীর্তিকে নষ্ট করিতে পারে নাই।......বারভুঁইয়াদের সাহস ও স্বাধীনতা-প্রিয়তাকে উদ্দীপিত করিতে পারিয়াছিল একমাত্র পদ্মা ও মেঘনার নির্মম ভাঙা-গড়া। —'বাংলা ও বাঙালী'

ভৌগোলিক ঐক্য প্রাচীন যুগে ছিল না, ছিল বিভিন্ন অঞ্চল—উত্তর বংগে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিম বংগে রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি ; দক্ষিণ ও পূর্ববংগে ছিল বংগ, সমতট, হরিকেল ও বংগাল ; এ ছাড়া উত্তর

ও পশ্চিম বংগের খানিকটা নিয়ে ছিল গৌড়। ভাষাসাম্য থাকলেও কোনো একটি ভাষা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতে :

> দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের লোহিত বন্ধুর উপত্যকা ও তালীবনবেষ্টিত সাগরকূলের বালেশ্বর, উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের সানুদেশে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া, পূর্বদিকে আসামের সুর্মা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল বারিধারা-প্লাবিত সমতল উদ্যান ও স্নিগ্ধ বনানী বাংলার সীমানা। বাংলার ইহাই প্রাকৃতিক পূর্ণাবয়ব। —'বিশাল বাংলা'

ভারত ও বাংলা

ভারতীয়তা থেকে বাঙালিত্বকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সংগত নয়, সম্ভবও নয়, বৈশিষ্ট্য স্বীকার করলেও। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলছেন :

> ভারত হইতেছে সাধারণ, বাংগালা হইতেছে বিশেষ। যাহা লইয়া বাংগালীর বাংগালিত্ব, বাংগালীর অস্তিত্ব তাহার মধ্যে বেশির ভাগই ভারতবর্ষের অন্যজাতির মধ্যেও মিলে; ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের সংগে সেই সব বিষয়ে বাংগালীদের সমতা আছে। —'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'

বিভিন্ন প্রদেশের বা অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় হয়েছে ভারতীয়তায়। এই ভারতীয়তা নিছক কল্পনাবিলাস নয়, একটা বাস্তব সত্য যা প্রত্যেক ভারতবাসীই জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনুভব করে রক্তে ও হৃদয়ে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় :

> সভ্যতা হচ্ছে মনের বস্তু। সুতরাং এ কথা যদি সত্যও হয় যে প্রাচীন আর্যদের সংগে বাঙালীর রক্তের সম্পর্ক এক পাই, তাহলেও আর্যসভ্যতার সংগে বাঙালী হিন্দুর মনের সম্পর্ক পোনেরো-আনা

তিন-পাই। ......আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমগ্র ভারতবর্ষে একটি ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করতে পারেননি — legal হিসাবেও নয়, spiritual হিসাবেও নয়। এক মোটামুটি শীলগত ঐক্য ছাড়া তাঁরা অপর কোনো বিষয়ে ভারতবাসীদের ঐক্য স্থাপন করতে পারেননি। —'নানা কথা'

এই শীলগত ঐক্যের অংশীদার আমরা, আর আমাদের রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য। শেষোক্ত ঐক্যটি বর্তমানে অত্যন্ত প্রবল। মুসলমানী আমলে এটির ভিত্তিস্থাপনার চেষ্টা হলেও স্বীকার করতেই হবে যে এর অনেকটাই ইংরেজের সৃষ্টি। এইখানেই নয়া ভারতের গোড়াপত্তন, নয়া বাংলারও।

বাঙালীর বৈশিষ্ট্য

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক জাতিরই স্বতন্ত্র প্রতিভা, স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে। আসামী ও পঞ্জাবীদের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই? ভারত যদি হয় 'সাধারণ' এবং বাংলা যদি হয় 'বিশেষ' তাহলে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা যায় না। একবার ব্রজেন্দ্র শীলের সংগে আলোচনার প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন:

বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণ-ধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে।...বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবনসাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই দিয়েছেন।...এজন্য এই দেশকে আজ পর্যন্ত কম দুঃখ সইতে হয়নি। প্রাণের নামে, মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে।...উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনাক্ষেত্রে।...কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই। বাংলা দেশের এই উদার

বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে। তার শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। . প্রাণী যেমন নানা খাদ্য হতে নানা প্রাণরস নিয়ে জীবনে সমীকৃত করে তেমনি নানা উপকরণ দিয়ে বাংলা দেশ তার শিল্প ও কলাকে জীবন্ত করে তুলেছে। বাংলা দেশের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে সুকুমার সূক্ষ্মতাবোধ। যে দরদী হাতে মসলিন সুতোর সৃষ্টি সেই হাতে বাংলার বহু সুকুমার শিল্প গড়ে উঠেছে। মাধুর্যের সংগে এ দেশের চির যোগ।·· সে ভালো 'বেনে' না হতেও পারে কিন্তু তার দেশ বিস্তৃত বলে তার দৃষ্টি উদার হবারই কথা।... বাংলা দেশ যে দেবভূমি নয়, এ দেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে।

—ক্ষিতিমোহন সেন : 'বাংলার সাধনা'

এই হল বাঙালীর মানসক্ষেত্রের বিশেষত্ব বা ব্যাপক অর্থে 'আধ্যাত্মিক' বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া বাস্তব জীবনে, ওয়াজেদ্ আলির মতে :

প্রথম যে বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হচ্ছে ভাষাগত ঐক্য।...দ্বিতীয়ত এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে মোটামুটিভাবে এমন একটা কুলগত ঐক্য আছে যেজন্য কে কোন ধর্ম্মের লোক সহজে তা বোঝা যায় না। ..বাঙালী শান্তিপ্রিয়...বাঙালী বুদ্ধিমান, ভাবপ্রবণ ..ধর্মের বিষয়ে সে উদার মত পোষণ করে... নূতনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভালোবাসা বাঙালী তার অন্তরে পোষণ করে।...কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে ভাবের চর্চাই বাঙালীর বেশি প্রিয়।...বাঙালী জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সমস্যা এক। আর বাঙালীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে ভিন্ন।...এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায়ের প্রভুত্বের সমস্যা প্রকৃত পক্ষে এদেশে ওঠে না।...বাংলা দেশে এমন এক কৃষ্টি এসে দেখা দিয়েছে যার দৃষ্টি স্বভাবতই ভবিষ্যতের দিকে এবং বিশ্বমানবতার দিকে।...গণতান্ত্রিক ভাব ভারতের অন্যান্য

প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে অনেক বেশি গভীর এবং ব্যাপক। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিকতা এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক। —'ভবিষ্যতের বাঙালী'

আর এক ভাবে দেখা যাক—বিশেষত উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত ভারতের সংগে তুলনা করে। বহুজাতির সমাগম ও রক্তমিশ্রণের ফলে বাঙালীর মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্যের চেয়ে শ্রেণী-সমন্বয় বেশি স্পষ্ট। বাংলাদেশেই বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব প্রচুর। এর ফলে বাঙালীদের মধ্যে একটা সহজ সাম্য ও ঐক্যবোধ আছে যা খাঁটি আর্যের জাতিভেদপ্রথার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হলেও নষ্ট হতে পারেনি। বাঙালীর ব্যক্তিত্ববোধ ও মানবিকতার মূল্যবোধ তার মনকে করেছে উত্তরভারতীয় দৃষ্টিভংগী থেকে পৃথক; তাই তার পারিবারিক জীবন ব্যবহারশাস্ত্র সমাজনীতি ধর্মপদ্ধতি ও সাধনা আর্যরীতি হতে বহুধা ভিন্ন। উত্তর ভারতের সমাজে একটা সনাতন ধারা রয়েছে, বাংলার মতো নমনীয়তা ও পরিবর্তনশীলতা নেই। বাংলার সমতলভুমিতে রাজনৈতিক যুগবিপ্লব বাধা পায়নি; অভিযানের স্রোতে বেতস-বৃত্তি অবলম্বন করে বাঙালী নিজের সমাজে সময়োপযোগী পরিবর্তন চালিয়ে গেছে। উত্তর ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে বিপর্যয় হয়েছে, কিন্তু গ্রাম্যজীবনে কোনো বিকার ঘটেনি। বন্ধুর কঠিন উদাসীন অনাসক্ত প্রকৃতি বার বার বাধা দিয়েছে, প্রতিরোধ করেছে নতুন আন্দোলনকে; সাময়িক আলোড়ন স্তব্ধ হয়েছে সনাতনী প্রতিক্রিয়ার সমাধিতে। তাই ভারতের উত্থান-পতনের মধ্যেও প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজরীতি চিরন্তন দৃঢ়তা নিয়ে আজো সেখানে বর্তমান।

সব যুগেই বাংলায় বড় বড় শহর ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে কাশী পুনা লাহোর দিল্লি ইত্যাদির মতো প্রাচীন বা স্থায়ী নগর এখানে গড়ে উঠতে পারেনি। তাই

বাঙালিত্ব প্রধানত গ্রাম্য জীবনের ওপরেই নির্ভর করেছে। আর গ্রাম্য জীবন বিপন্ন হলেই বাঙালিত্ব বিপন্ন হয়েছে বার বার, রূপান্তরও হয়েছে বার বার। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীর মন প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিশেষ ভাবে পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু আধুনিক বাঙালী তার পূর্বপুরুষ থেকে অনেক বিষয়েই ভিন্ন। এই প্রগতিশীলতা বাঙালীর জীবনে অতি স্বাভাবিক ভাবে ঐতিহাসিক কারণেই এসেছে। একে তার উন্নতি বা অবনতির লক্ষণ বলে অভিহিত না করে বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করাই বোধ হয় যুক্তিসংগত হবে।

যাই হোক, বাঙালীর যে অখণ্ডতা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখন আমরা পূর্ণবিশ্বাসী সে বস্তুটি কিন্তু প্রাচীন যুগে অসম্পূর্ণ ছিল। ভাষাগত ও জাতিচৈতন্যগত ঐক্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এবং মধ্যযুগে বা মুসলমান অধিকারের সময়েই বেশ পুষ্টি লাভ করে। অর্থাৎ মুসলমান আমলেই বাঙালীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। কোনো বিরোধ বা বিপ্লবই আজ পর্যন্ত সেই অনুভূতিকে নষ্ট করিতে পারেনি।

মেকলে ও গস্ওয়র্থ্

ইংরেজী শিক্ষা ও দণ্ডনীতি প্রচলন করতে এসে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মেকলে বাঙালীকে সহ্য করতে না পেরে তার তীব্র কুৎসা করে গেলেন। ১৯৩৯ এর মহাযুদ্ধের পর কবি গস্ওয়র্থ্ বাংলা দেশ থেকে ফিরে গিয়ে বাঙালীর, বিশেষত বাঙালী মেয়েদের, প্রশংসায় পঞ্চমুখ! এই তীব্র মতদ্বৈধও প্রমাণ করে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ; অবশ্য প্রশংসা ও নিন্দা নির্ভর করে দৃষ্টিভংগীর ওপরে।

২ : ইতিহাসের পাতায়

ভারতের ইতিহাসের প্রথম দিকের পাতাগুলোয় বাংলার নাম অস্পৃষ্ট, বাঙালীর স্বাক্ষর নেই। প্রাক্-আর্য যুগে দ্রাবিড় মোংগল কোল প্রভৃতি জাতির মিলন-মিছিলে বাংলার কী অপরূপ সত্তা ছিল তা আজ আমাদের জানা নেই। শুধু অস্তিত্বের ইসারা মেলে কয়েকটা জায়গার নাম ও কয়েকটা প্রচলিত শব্দে।

প্রাচীন যুগ

অবশ্য মহাভারতে কয়েকবার বাংলার কথা আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তিনজন বাঙালী রাজা পাণিপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের সংগে এঁদের বিরোধও হয়েছিল কিছু পরে ; হয়ত সেইজন্যই এঁরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষ নেন। কিন্তু যথেষ্ট পরাক্রম সত্ত্বেও এঁরা শেষে বশ্যতা স্বীকার করেন। মহাভারতের যুগে বাংলা দেশ কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কর্ণের অধিনায়কত্বে বাংলা বিহার উড়িষ্যার কয়েকটি অংশ বড়ো একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সিংহলের 'মহাবংশ' নামে পালিগ্রন্থে বাঙালী বিজয়সিংহের লংকা দ্বীপে রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কথা পাওয়া যায়, কিন্তু তার ঐতিহাসিক ভিত্তি অটল নয়।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দে আলেক্জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময়ে বাঙালী রাজ্যের বিস্তার ছিল পঞ্জাব পর্যন্ত। আর এই রাজ্যের রণহস্তীর ভয়েই নাকি গ্রীক বীর ভারত ত্যাগ করেন। কিন্তু গ্রীক লেখকদের কাছ থেকে বাঙালী গংগারিডি জাতির এই প্রশংসাটুকু ছাড়া ঐতিহাসিক তথ্য আর কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য টলেমির

বিবরণ থেকে জানি যে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্বাধীন বাঙালী রাজ্য ছিল, আর ছিল তার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি। কিন্তু প্রায় ছ শো বছরের উত্থান-পতনের ধারায়, গ্রীক-শক হুণ-পহ্লব জাতির অভিযানের প্লাবনে, আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের যুগ-বিপ্লবী পরিবর্তনে বাংলার চিহ্ন আর মেলে না। বাঙালীর ইতিহাসে এ এক বিস্মৃত লুপ্ত অধ্যায়।

বাঙালীকে আবার আমরা দেখলাম খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে—গুপ্ত যুগে। গুপ্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ে বাংলায় ছিল কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য। সিংহবর্মা ও তাঁর ছেলে চন্দ্রবর্মা ছিলেন পশ্চিম বংগের স্বাধীন রাজা। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়াতে এঁদের প্রাচীন লিপি এখনো রয়েছে। দামোদর নদের দক্ষিণে পোখর্ণা গ্রামেই বোধ হয় এঁদের রাজধানী ছিল। গুপ্তেরা বাংলাকে জয় করলেও সম্পূর্ণ অধিকারে আনতে পারেননি, খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে বাংলায় স্বাধীনতা ছিল। গুপ্ত সম্রাটদের দুর্বলতার সময়ে একাধিক বাঙালী রাজা স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করেন।

গৌড় অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে শশাংকই বাঙালী রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি হন আর তাঁর অধিনায়কতায় খণ্ড রাজ্যগুলি সম্মিলিত হয়। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ—মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছেই। বাণভট্টের ও হুয়েন্-সাঙের নিন্দা সত্ত্বেও আর্যাবর্তে বাঙালীর রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও আংশিক সাফল্যের জন্য শশাংকের নাম বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। কূটনীতি ও সামরিক শক্তির প্রয়োগে তিনি মৌখরিরাজ ও উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধনের চেষ্টা ব্যর্থ করে বংগ-বিহার-উড়িষ্যায় আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।

কিন্তু শশাংকের মৃত্যুর পর এক শো বছর কেটেছে আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে আর বহিঃশত্রুর আক্রমণে, অরাজকতায় আর মাৎস্যন্যায়ে;

প্রবল করেছে অত্যাচার দুর্বলের ওপর, বড়ো মাছ খেয়েছে ছোট মাছকে। তারপর দীর্ঘকালের রক্তপাত আর শোষণ আনল গণতান্ত্রিক সমাজবোধ ও শান্তির জন্য স্বার্থত্যাগ। অষ্টম শতাব্দীর ভারতে এ এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। দেশের নেতারা ও জনসাধারণ সমস্ত বিরোধ বিসর্জন দিয়ে গোপালকে করলেন রাজপদে নির্বাচন আর এই শুভবুদ্ধি আনল বাংলায় এক অভাবনীয় যুগান্তর।

এবার শুরু হল প্রায় এক শো বছরের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। ধর্মপালের সময়ে বাঙালীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার মূল কারণ হচ্ছে তার দ্রুতবর্ধমান আত্মশক্তিবোধ ও সেই শক্তিতে পূর্ণ আস্থা। এই নতুন জাতীয় জীবনই অনুপ্রাণিত করেছে ধর্মপালের সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা। গুর্জররাজ ও রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে ব্যাহত হয়েও এই নতুন শক্তি নিরুদ্যম হয়নি। সারা আর্যাবর্তে বাঙালীর এই দৃঢ় প্রতাপের ইতিহাস আজ দিবাস্বপ্নের মতোই অনিশ্চিত বলে মনে হয়; শুধু কয়েকটা তাম্রশাসন শিলালিপি ও তিব্বতী পুঁথির মধ্যে অতীতের সেই দুর্বার আশার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মেলে। দেবপালের সময়েও সাম্রাজ্যবিস্তার অক্ষুণ্ণ ছিল; উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে কাশ্মীর ও পূর্বে আসাম পর্যন্ত ছিল রাজ্যের সীমানা। কিন্তু তারপরেই আরম্ভ হয় অধঃপতন; গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর ধারাবাহিক আক্রমণে বিশাল সাম্রাজ্য ক্ষীণকায় হতে থাকে। বাংলা দেশে আবার খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয়।

দশম শতাব্দীর শেষ দিকে মহীপালের আমলে পালগৌরব আবার ফিরে এল। কলচুরিরাজ ও চোলরাজের কাছে সাময়িক ভাবে পরাভূত হলেও মহীপাল রাজ্যবিস্তারে ক্ষান্ত হননি। কিন্তু তাঁর পরেই অধঃপতনের পুনরাবৃত্তি, গৃহবিবাদ আর বহিঃশত্রু, স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উৎপত্তি। অবশেষে বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহী সামন্তেরা কৈবর্তজাতীয় দিব্যকে রাজা করেন। দ্বিতীয় মহীপাল এই বিদ্রোহে

নিহত হলেও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল পরে হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। বাংলার বাইরেও তাঁর প্রতিপত্তি স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাঁর পরে নেতৃত্বের অভাবে পালরাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সময়ের সংগে বেড়েই চলে এবং এর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একাদশ শতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে পালরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে উঠল সেনরাজ্য। সেনবংশীয়েরা সম্ভবত অবাঙালী ছিলেন—কর্ণাটী ব্রহ্মক্ষত্রিয়। হয়তো দাক্ষিণাত্যের কোনো অভিযানের সময়ে এঁরা এসেছিলেন এবং পরে পালেদের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা বিজয় সেন প্রায় গোটা বাংলাতেই আধিপত্য করেছিলেন। সেনবংশীয়েরাই পালযুগের শেষে অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় থেকে বাঙালীকে রক্ষা করেন। বল্লাল সেনের কীর্তি সমাজসংস্কার ও মিথিলাজয়। শান্তি ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে বল্লাল সেন বাঁচালেন বাঙালীকে; কিন্তু তাঁর সমাজসংস্কার যে একদিন 'বল্লালী-বালাই' হয়ে উঠবে তা কেউ বোঝেনি। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন প্রায় সারা জীবন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বাংলার সীমানা বিস্তার করেন—উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিংগ ও পশ্চিমে মগধের খানিকটা। বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণ সেন যখন নবদ্বীপে অবস্থান করছিলেন তখনই তাঁর রাজ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হয়। সুন্দরবনের খাড়ী পরগণায় ডোম্মন পাল স্বাধীন খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরাপথে সারা আর্যাবর্তে তখন চলছে যুগ-বিপর্যয়—মহম্মদ ঘোরীর বিজয় অভিযান। ঘোর দুর্যোগের এই অন্ধকারময় দিনগুলোয় ইতিহাসের আলোড়নের কোনো বিবরণই আমরা পাই না।

নবদ্বীপ-বিজয় সম্বন্ধে মিন্‌হাজ্‌উদ্দিনের যে সতেরো-ঘোড়সওয়ারী কাহিনী প্রচলিত আছে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তা অসম্ভব বলেই মনে হয়। মিন্‌হাজ্‌ নিজেই লক্ষ্মণ সেনের শৌর্য ও শাসননৈপুণের জন্য

তাঁকে আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে প্রশংসা করে আল্লার কাছে বিধর্মী 'লখ্‌মনিয়া'র লঘু শাস্তির জন্য আবেদন পেশ করেন। আসলে নদীয়া-বিজয় একটি অতর্কিত সামরিক 'কুপ্‌' বা 'ব্লিট্‌জ্‌' চাল যার জন্য রাজপ্রাসাদে একটা তুমুল গণ্ডগোল হয় ও বৃদ্ধ রাজা পালাতে বাধ্য হন। ফলে শহরে যে বিশৃংখলা হয়েছিল তারই সুযোগ নিয়ে কিছু পরে আগত মুসলমান সেনা লুঠতরাজ করে। অপ্রস্তুত বৃদ্ধ রাজার পলায়ন কাপুরুষতা নির্দেশ করে না; ইতিহাসে এ রকম ঘটনা অনেক ঘটেছে। রক্ষীদের মূর্খতা বা নগরপালের বিশ্বাসঘাতকতাও এ ব্যাপারের জন্য দায়ী হতে পারে।

১২০২ অব্দে নদীয়া আক্রমণের পরেও সেন বংশ রাজত্ব করেন, কিন্তু এখন থেকেই আঞ্চলিক স্বাধীনতার ধুম পড়ে যায় আর খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হতে থাকে। তা ছাড়া তুর্কি আক্রমণ তো ছিলই। স্বাধীন বাংলায় ভাঙন লাগে। পালসাম্রাজ্যের দুর্বলতার যুগে যেমন পূর্ববঙ্গে বর্ম রাজবংশের উৎপত্তি হয় তেমনি সেন রাজত্বের শেষ দিকে গজিয়ে ওঠে দেববংশ ও পট্টিকেরা রাজ্য। ঢাকা ও শ্রীহট্টের তাম্রশাসনে দেববংশের নাম পাওয়া যায়। পট্টিকেরা রাজ্য আরো পুরানো। ১৯৪৩ সালে সামরিক কারণে মাটি খুঁড়তে গিয়ে কুমিল্লায় ময়নামতী পাহাড়ের কাছে প্রায় দশ মাইল জায়গায় এই রাজ্যের বিশাল নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাংলায় ইসলামী শাসন স্থায়ী হয়ে বসতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল; স্বাধীনতা ফিরে পাবার চেষ্টাও আংশিকভাবে একাধিক বার হয়েছিল।

রাজ্যবিস্তারের যুগে বাঙালী ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল; সীমানা-সংকোচনের সময়ে তারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়নি। বরেন্দ্রভূমির গদাধর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের অধীনে মাদ্রাজের বেলারি জেলায় কোলগল্লু গ্রামে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। প্রায়

১২০০ সালে গাড়্ওয়াল্ অঞ্চলে বাঙালী অনেকমল্ল রাজত্ব করতেন। আবার পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর মাঝখানে পার্বত্য রাজ্যের স্থাপনা করেন সপ্তম শতাব্দীতে আর এক বাঙালী—তাঁর নাম ছিল শক্তি। পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে সুকেত কাষ্ট্ওয়ার কেওন্থল্ ও মণ্ডি রাজ্যের রাজারা ছিলেন বাঙালী।

পাল ও সেন রাজ্যের সামরিক বিভাগ বা রণপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ না পেলেও মনে হয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত ব্যবস্থাই মোটামুটি ভাবে এখানে প্রচলিত ছিল। মহাসেনাপতির অধীনে থাকত পদাতিক, হাতি, উট, ঘোড়া ও নৌবাহিনী। বাঙালীর নৌশক্তি যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সেকথা কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। হস্তিবাহিনীর প্রসিদ্ধি গ্রীক অভিযানের সময় থেকেই ছিল। ঘোড়া আনতে হত অবশ্য কাম্বোজ থেকে। যুদ্ধরথের প্রচলন ছিল, তবে খুব বেশি ব্যবহৃত হত বলে মনে হয় না। সৈন্যবাহিনীতে অবাঙালীকেও প্রয়োজনমতো নেওয়া হত।

হাজার বছরের প্রাচীন যুগের রাজনৈতিক ধারা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি তথ্য মেলে :

(১) ভারতের ইতিহাসে বাঙালী মোটেই অপরিচিত ছিল না; বরং অনেক সময়েই সে বেশ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস শুধু অবাঙালীর ইতিহাস নয়।

(২) বাংলার সীমান্ত পার হয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করা ও তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া বাঙালীর পক্ষে একাধিক বার সম্ভব হয়েছিল, আর সে সাম্রাজ্যের গৌরব কোনো অবাঙালী রাজ্যের গৌরবের চেয়ে কম ছিল না।

(৩) বাঙালীর রাজনৈতিক ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চল; বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তার জাতীয় জীবন গড়ে উঠেছে। তার রাজনৈতিক

চেতনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে মাৎস্যন্যায়ের যুগে গোপালকে রাজপদে নির্বাচন।

(৪) বহিঃশত্রুর আক্রমণ বাঙালীকে বার বার ব্যস্ত করেছিল, কিন্তু তা হলেও স্বাধীনতার দৃঢ় কামনা আত্মপ্রকাশ করেছে নানাভাবে। অখণ্ড বাঙালী রাজ্যের চেষ্টা কখনো খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে ঐক্যের অভাবে প্রায় প্রত্যেক যুগেই জাতীয় জীবন বিপন্ন হয়েছে। আঞ্চলিক স্বাধীনতা আর অন্তর্দ্বন্দ্ব বাঙালীর অপরিমেয় রাজনৈতিক সম্ভাবনাকে গুরুতর ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে বারবার।

(৫) অনার্য ধর্ম, হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধ ধর্ম—একটার পর একটা ধর্মের স্রোতে বাংলার রাজনীতি বিশেষ কিছুই পরিবর্তিত হয়নি অর্থাৎ প্রাচীন যুগে বাংলার মাটিতে ধর্মের গোঁড়ামি রাজনীতিকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারেনি।

মধ্য যুগ

লক্ষ্মণ সেনের পরাজয় নানা কারণে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু মুসলমানেরা যে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই আধিপত্য স্থাপন করেছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এর কারণ কী? বাঙালী হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তখন শৌর্য বীর্য বলতে কিছুই ছিল না এমন নয়। তাদের বীরত্বের প্রমাণ সারা মধ্য যুগেই ছড়ানো রয়েছে। মধ্য যুগে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে অনেক কম ছিল, সুতরাং সে যুগের গণবীর্যের দাবি হিন্দুরাই করতে পারে, যদিও সামরিক নেতৃত্ব মুসলমানেরই বেশি।

হিন্দু রাজত্বের পতনের প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সেই কারণে নেতৃত্ব ও সংঘশক্তির অভাব। তাছাড়া গতানুগতিক রণপদ্ধতির কালানুযায়ী কোনো পরিবর্তন বা উন্নতি হয়নি। হিন্দু-ও-

বৌদ্ধ ধর্মের নানাবিধ বিকৃতিও বাংলার সমাজজীবনকে দুর্বল করে ফেলেছিল, আর তথাকথিত আধ্যাত্মিক চর্চার আধিক্যে দেশের বাহুবলও অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অদৃষ্টবাদ ভারতের এবং বিশেষত বাংলার মাটির বৈশিষ্ট্য। মুসলিম অভিযানকে তাই নেতৃত্বহীন বিক্ষিপ্ত ও বিহ্বল জনসাধারণ নিজেদেরই পাপের ফল ও ঈশ্বরের অমোঘ বিধান বলে স্বীকার করে নিয়ে মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। বল্লালী নিয়ম বা আদিশূরী নীতি যে অবাঙালী পন্থা নির্দেশ করেছিল তাতে হিন্দুদের মধ্যে জাতিবিরোধ ও হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষও খানিকটা হয়েছিল; ফলে প্রতিরোধশক্তি আরো কমে গেল। বাংলায় উচ্চবর্ণের সংখ্যাল্পতা থেকেই বোঝা যায় যে জাতের বালাই আগে বিশেষ ছিল না; এটা অবাঙালী সেন রাজা ও কনৌজী ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। 'সপ্তশতী' ব্রাহ্মণ-শ্রেণী থেকেই বোঝা যায় এ দেশে প্রাচীন যুগের শেষেও বাঙালী ব্রাহ্মণ সংখ্যায় কতো কম ছিল। যাই হোক, এই কৃত্রিম শ্রেণী-বিরোধের সংগে আবার ভাবতে হবে সেনযুগের শেষ দিকে নৈতিক অধঃপতন ও বিলাসিতার কথা। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন যে সেনবংশের কেশব কৌমার্যে শক্তিচর্চা করলেও বখতিয়ারের সময়ে তিনি হয়তো সুন্দরীদের দলে উদ্ভট শ্লোকের তাৎপর্য-উপলব্ধিতেই ব্যস্ত ছিলেন। নানা কারণে মানস ক্ষেত্র আগে থেকেই কুসংস্কারী ধর্মোপদেশের মধ্য দিয়ে কল্কি অবতারের জন্য প্রস্তুত ছিল, আর তাই নির্বীর্য ধর্ম-ও-সমাজ-নেতারা সহজেই নিরক্ষর লোককে বোঝালেন:

ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কালো টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান ..
ব্রহ্মা হৈলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম...
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তেঁহ হইল হায়া বিবি...

—রামাই পণ্ডিত: 'শূন্য পুরাণ'

প্রাচীন যুগের অবসানের সময়ে বাংলার অবস্থা ছিল এই। অপর দিকে মধ্য প্রাচ্যের মরুভূমির দুর্ধর্ষ বর্বর সন্তানেরা জগজ্জয়ে বেরিয়ে পড়েছিল নবলব্ধ ইসলামী ধর্মের প্রেরণায়। লুণ্ঠন, আধিপত্য ও ধর্মপ্রচার — এই ছিল তাদের অভিযানের নীতি। বৌদ্ধ-বিহার বা হিন্দু-মন্দির ধ্বংসের কারণ শুধু ধর্মবিদ্বেষ নয়, জাতির মর্মস্থানে আঘাত করে বিহ্বল ও নিরাশ করে দেওয়া। ধনসম্পত্তির লোভ তো ছিলই, বিশেষত এই ধর্মকেন্দ্রগুলিই যখন হয়ে উঠেছিল ধনাগার। তা ছাড়া মৃত্যুর অন্ধকারও দূর হয়েছিল এক পরমলোভনীয় বেহেস্তের আলোয়। অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিরা তাই তাদের শান্তিপ্রিয়তা ও সংস্কৃতির ফলে এই দুর্বার ও উন্মত্ত বাহুবলকে অনেক ক্ষেত্রেই রোধ করতে পারেনি।

মধ্য যুগের প্রায় চার শো বছর পাঠানী আমল বলে অভিহিত হলেও শাসক-সম্প্রদায় সব সময়েই 'পাঠান' ছিলেন না—কখনো আরব, আবিসিনীয় ('হাবসী'), খোজা, কখনো বা হিন্দু। পাঠান আমলে প্রায় কোনো কালেই সমগ্র বাংলায় মুসলমান শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, প্রত্যন্ত অঞ্চলে তো নয়ই। হিন্দু জমিদার ও সামন্তেরা যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতেন, স্বায়ত্ত-শাসনও সর্বত্র প্রচলিত ছিল। পাঠানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হিন্দুবিদ্রোহ এ যুগের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ধারা, কিন্তু প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সমগ্র বাংলার দিল্লি থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টা। সে চেষ্টা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে সমভাবেই প্রবল ছিল। মোগলেরা তাই প্রথম থেকেই বাংলার এই দিল্লি-বিরোধিতা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। বাংলার কাছে 'দিল্লি অনেক দূর।'

চার শো বছরের পাঠানী আমল কয়েকটি ব্যক্তি ও বংশের দ্রুত উত্থান-পতনের ইতিহাস। প্রথম দিকে বাংলা মোটামুটি তিন ভাগে

বিভক্ত হয় এবং স্থানীয় কর্তারা বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের মধ্যেই বছর কাটিয়ে যেতেন। মাঝে মাঝে দিল্লির সুলতান বিদ্রোহ দমন করে শাসনকর্তা বদলে দিতেন, কিন্তু শেষ দিকে প্রায় দু শো বছর বাংলার শাসনকর্তারা স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ ইলিয়াস্ শাহী রাজত্ব। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বাধীন হিন্দু রাজা গণেশের আবির্ভাব। তাঁর পুত্র যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দীন নামে রাজত্ব করেন। সমসাময়িক স্বাধীন হিন্দু রাজা দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেবের নামও পাওয়া যায়, তবে এঁদের সম্বন্ধে ইতিহাস স্পষ্ট কিছুই বলে না। জালালের পরে রাজত্ব করেন নসিরুদ্দিন শাহ ও তাঁর দুই ছেলে, কিন্তু তার পরেই আবার দ্রুত পরিবর্তনের স্রোতে অনেকের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

১৪৯৩ থেকে ১৫১১ পর্যন্ত হোসেন শাহের রাজত্বই বাংলায় পাঠানী আমলের 'স্বর্ণযুগ'। হোসেন হাবসী ও নিগ্রোজাতীয় মুসলমানদের প্রভাব বাংলায় নষ্ট করে দেন; উড়িষ্যালুণ্ঠন আর ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের সংগে বিরোধ ছাড়া তাঁর রাজ্যে সামরিক ব্যাপার বিশেষ কিছু হয়নি। এঁর রাজসভার পোষকতায় এবং শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙালী সংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। হোসেনী বংশের পরে উল্লেখযোগ্য পাঠান শের শাহ। বাংলা ও বিহারের আধিপত্য থেকে ইনি দিল্লির সিংহাসনে উঠেছিলেন। তখনকার ভারতে শের সাহের মতো প্রতিভাবান ও পরাক্রান্ত নেতা আর কেউ ছিল না। বাংলা দেশে উন্নত শাসনপ্রণালীর প্রবর্তন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। কিন্তু তাঁর পরেই আবার শুরু হল দ্রুত পরিবর্তন। বোধ হয় জালাল শাহের সময়েই আবির্ভাব কুখ্যাত কালাপাহাড়ের। এই ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণসন্তান ১১ বছর সারা পূর্বভারতে হিন্দুত্বের ধ্বংসব্রতে একটা দুর্যোগের মতো ঘুরেছেন।

প্রভুত্বের দাবি নিয়ে মোগল-পাঠানের বিরোধ চলেছিল

অনেকদিন ; এর সমাপ্তি হল দায়ুদ খাঁর মৃত্যুতে (১৫৭৬)। চার শো বছরের পাঠানী আমল শেষ হল, শুরু হল মোগল যুগ। কিন্তু সমগ্র বাংলায় মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের তীব্র প্রতিরোধের জন্য। মোগল আমলে সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা হয় দিল্লিতে। এতে বাংলার প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক গণ্ডীর সংকীর্ণতা অনেকটা গেল বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন শোষণে পরিণত হতে লাগল। মোগল সুবেদারদের সময়ে শৃংখলাবদ্ধ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হলেও রাজস্বের দিল্লিযাত্রায় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। পোর্তুগীজ ও মগেদের অত্যাচারও বাংলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়। পরে ইসলাম খাঁ ও কাশিম খাঁ অনেক কষ্টে এদের নির্মূল করেন। আর এক ঘটনা : সাজাহানের সময়ে ইংরেজ বণিকের আবির্ভাব। আওরংজেবের রাজত্বে শায়েস্তা খাঁ হুগলি থেকে ইংরেজকে দূর করে দেন, কিন্তু পরে আবার অনুমতি দেওয়া হয়।

আওরংজেবের রাজত্বের শেষ দিকে বাংলার জবরদস্ত সুবেদার হন ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণসন্তান মুর্শিদকুলি খাঁ। রাজস্বের জন্য ও অন্যান্য ব্যাপারেও ইনি হিন্দুদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করতেন। সরফরাজ ছিলেন যেমন বিলাসী তেমনি দুশ্চরিত্র ; শোনা যায় তাঁর হারেমে নাকি হাজারখানেক নারীর বসতি ছিল। এই সরফরাজকে হত্যা করেই আলিবর্দি নবাব হয়ে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। অনেক দিন পরে একজন যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব হল। কিন্তু উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বারবার মারাঠী বর্গির উৎপাতে বিব্রত হয়েছিলেন।

এই জনপ্রিয় নবাবের দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। ১৯ বছর বয়সে নবাব হয়ে সিরাজ মাত্র চারমাস রাজত্ব করেছিলেন। অতিরিক্ত আদরে সিরাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটে। দোষ ছিল তাঁর অনেক,

যদিও তাঁর সম্বন্ধে কুৎসা-কাহিনীর সবগুলো সত্য নয়। তবে আলিবর্দির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হোসেন কুলি খাঁর হত্যা, নিজের মাসী ঘসেটি বেগমের সম্পত্তিলুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপার ঐতিহাসিক। শোনা যায় তিনি নাকি নারীর ছদ্মবেশে জগৎ শেঠের অন্দরে ঢুকেছিলেন ; রাণী ভবানীর মেয়ে তারাসুন্দরীর ওপরেও তাঁর নাকি লোভ ছিল। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে অত্যাচারী দুশ্চরিত্র বিলাসী ও রূঢ় জমিদার বা নবাব তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বহু ছিলেন। এটা সনাতন ব্যাপার, সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য নয়। 'বংগ-গৌরব' প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও অনেক লজ্জাকর কাহিনী প্রচলিত আছে। সিরাজের চরিত্রে কলংকলেপনের জন্য ইংরেজও যে খানিকটা দায়ী তা 'অন্ধকূপ হত্যা'-র মিথ্যা বিবরণ থেকেই বোঝা যায়। তবে সিরাজ যে জনপ্রিয় ছিলেন না তাও স্পষ্ট বোঝা যায়। মীর জাফর বা জগৎ শেঠের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বাদ দিলেও দেখি পরাজয়ের পর নিরাশ্রয় উপবাসী নবাবকে ধরিয়ে দিয়েছে ফকির দানা শা। তারপর মীরনের নিষ্ঠুর আদেশ, মহম্মদী বেগের পাশবিক আঘাত ; হাতীর পিঠে মৃত নবাবের ছিন্ন দেহ পথে পথে ঘুরেছে, রক্ত ঝরেছে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ, কোনো আন্দোলন বা চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। মীরমদন ও মোহনলাল প্রাণ দিয়েছিল দেশের জন্য, সিরাজের জন্য নয়। তাঁর দেশপ্রেম ছিল, ইংরেজের প্রভুত্ব তাঁর সহ্য হয়নি—এ কথা ঠিক। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে ভালো-মন্দ মিশিয়ে সিরাজ ছিলেন তখনকার দিনের একটি অসাধারণ ব্যক্তি। মধ্য যুগের অন্য অনেক যুদ্ধবিগ্রহের মতোই পলাশীর যুদ্ধকে আমরা ভুলে যেতাম, আর সিরাজকেও ; ভুলিনি, কারণ এখানে দেখি বিদেশী শক্তির সংগে প্রভুত্বের লড়াই আর বাংলার তথা ভারতের শোচনীয় পরাজয়। দু শো বছরের ইংরেজী শাসনই দিয়েছে সিরাজ আর পলাশীকে এক অপরিমেয় ঐতিহাসিক মূল্য।

কিন্তু সিরাজের পরেই ইংরেজী প্রভুত্ব আরম্ভ হয়ে যায়নি। মীর জাফরের কথা বাদ দিলেও মীর কাশিমের সংগে ইংরেজের সংঘর্ষ মনে রাখতে হবে। ১৭৬৫ সালেও সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে ক্লাইভ্‌কে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি নিতে হয়েছিল। এই সময় থেকেই বাংলায় ইংরেজী আমলের শুরু হয়।

পাঠান এমন কি মোগল যুগেও বিভিন্ন সময়ে শক্তিশালী জমিদারেরা বিদ্রোহ করে আঞ্চলিক স্বাধীনতা বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে 'বারভুঁইয়া'-শ্রেণীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বারোজন সামন্ত রাজা নিয়ে মণ্ডল-রচনার প্রথা হিন্দু যুগেও ছিল : 'বারভুঁঞা বসে আছে বুকে দিয়ে ঢাল' (মাণিক গাংগুলির ধর্মমংগল কাব্য)। মোগল-পাঠান বিরোধের সময়েও বৈদেশিক লেখকেরা এই রীতি লক্ষ্য করে বলেছেন যে তখন বারোজনের মধ্যে তিনজন ছিলেন হিন্দু ও তাঁদের আধিপত্য ছিল শ্রীপুর, চন্দ্রদ্বীপ ও সুন্দরবন অঞ্চলে। সোনার গাঁ-র ঈশা খাঁ ছিলেন হিন্দুবংশজাত। তিনি বিশেষ শক্তিশালী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শ্রীপুরের চাঁদ ও কেদারের সংগে বিরোধ ছিল তাঁর—শোনা যায়, নারীঘটিত ব্যাপারের জন্য। শ্রীপুরের কীর্তি ধ্বংস করেই পদ্মা নদী হয়েছে 'কীর্তিনাশা'। যশোরের প্রতাপাদিত্য ছিলেন আর এক দুর্দান্ত ভুঁইয়া ; মানসিংহের হাতে এঁর ধ্বংস হয়। আর এক ক্ষমতাশালী জমিদার চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র। ভূষণা বা ফরিদপুরের মুকুন্দরাম প্রায় সারা জীবন মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে গেছেন ; এঁর পুত্র সত্রাজিৎও মোগলদের যথেষ্ট অশান্তি দিয়েছিলেন। আর এক বিদ্রোহী ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য। এঁরা সকলেই দিল্লি-অধিকৃত বাংলাতে থেকেই বিদ্রোহের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মোগল-পাঠান আমলে বাংলার প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতে মুসলমান শাসন স্থায়ীভাবে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বন-বিষ্ণুপুর এই সুযোগে স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু

এই সব বিদ্রোহীরা কখনও একযোগে দেশকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করেননি।

মুসলমানী আমলে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য— বিদেশী বণিকের আবির্ভাব ও অত্যাচার। পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ এদেশে আসে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রভুত্বের ব্যবস্থা হয়। পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজেরা শক্তিহীন হয়ে পড়লেও সংঘর্ষ চলে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে। সিরাজকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন ক্লাইভের বিরুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি। পোর্তুগীজেরা দস্যুবৃত্তি পছন্দ করত বেশী, আর তাদের জলযুদ্ধের নৈপুণ্য বাংলার সমুদ্রতীরে ও অসংখ্য নদীতে বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়। এরা বাঙালীর বাণিজ্য নষ্ট করে দেয় আর এদের অত্যাচারে বর্ধিষ্ণু সুন্দরবন অঞ্চল জংগলে পরিণত হয়। কার্ভালো ও গঞ্জালেস্ প্রভৃতি দলপতিদের অত্যাচারে বাংলার হিন্দু-মুসলমান বিধ্বস্ত হতে থাকে। লুণ্ঠন নারীহরণ ধর্মান্তরীকরণ দাসত্ব ইত্যাদি নানাভাবে বাঙালী এদের কাছে লাঞ্ছিত হয়। অথচ বাংলার বিদ্রোহী জমিদারেরা অনেক সময়েই এদের সাহায্য নিয়েছেন। ফিরিংগিদের সংগে আরাকানী মগদের মাঝে মাঝে বিরোধিতা হলেও অনেক সময়েই এরা যুক্ত হয়ে বাংলায় অত্যাচার করেছে। মগদের উৎপাতও যে কতো ভয়ংকর হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে 'মগের মুলুক' কথার ব্যবহার থেকে। মগ-ফিরিংগিরা সাধারণের কাছে 'হার্মাদ' ('আর্মাডা' থেকে) নামেই পরিচিত ছিল। কবিকংকণ বাঙালী সদাগরের নৌযাত্রা সম্বন্ধে বলেন :

> ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে ;
> রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে।

ইসলাম খাঁ ও শায়েস্তা খাঁ সতেরো শতকের শেষার্ধে এদের দমন

করেন। মগেরা পলায়নের সময়ে ('মগ-ধাওনি') চট্টগ্রাম জেলায় ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে তাদের বুদ্ধবিগ্রহ ও ধনরত্ন মাটির তলায় রেখে গিয়েছিল ; আজো নাকি তাদের পুরোহিতেরা সেই ধনরত্নের সন্ধান করে। মোগল আমলের শেষ দিকে বাংলায় শুরু হল আর এক উৎপাত—বর্গির হাংগামা। ভাস্কর পণ্ডিত, রঘুজী ও বালাজীর অত্যাচারে আলিবর্দি বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন ; অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর একটা মীমাংসা হয়।

মধ্যযুগে যুদ্ধব্যবস্থা ছিল চতুরংগের—পদাতিক, গজ, অশ্ব, নৌশক্তি। পশ্চিম বংগে শেষেরটির প্রয়োজন বিশেষ হত না জলপথের অভাবে। পূর্ব ও দক্ষিণ বংগে নৌবাহিনীর বিশেষ চলন ছিল। ভুঁইয়াদের অধীন পোর্তুগীজদের ওপরে অনেক সময়ে নৌবাহিনী চালনার ভার থাকত। আবার কখনো কখনো পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে, বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চলে, নৌশক্তি গঠন করতেন 'বহরদার' বাঙালী হিন্দু-মুসলমান। 'নুরন্নেহা ও কবর' নামক পূর্ববংগ-গাথায় জাহাজের বহর কী ভাবে যুদ্ধ করত তার বিবরণ আছে। মুসলমানেরা কোরাণবাহী জাহাজকে অগ্রগামী করে অভিযান শুরু করতেন, পেছনের জাহাজে থাকত কামান ইত্যাদি। 'শ্লূপ্' বহরই বেশী চলত : শ্লূপ্ নৌকা প্রায় বালাম্ নৌকারই মতো, আকার ও নামের পরিবর্তন পোর্তুগীজ প্রভাবে। ষোলো বা তারও বেশি দাঁড়ের এই নৌকাগুলি বিশেষ ক্ষিপ্রগতি ছিল। প্রতীহার, আগরি, গোয়ালা, বাগদি, লোহার, পাটন, ডোম, হাড়ি ইত্যাদি জাত থেকেই তখন বাঁধা 'জুঝার' বা স্থায়ী যোদ্ধা নেওয়া হত। তাছাড়া ভাড়াটে সেনা নেওয়া হত প্রধানত মুসলমান, চৌহান রাজপুত, ওড়িয়া, তেলাংগি ও পরে ফিরিংগি সাধারণ থেকে।

রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমংগল'-কাব্যে তখনকার ফৌজের বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজার ডাকে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল, সেজে এল নানা রকমের সেনা :

হাসন হুসেন সাজে পায়ে দিয়ে মোজা,
যাহার সংগতি সাজে বাইশ হাজার খোজা।

কাল ধল রাংগা টুপি সবাকার মাথে,
রামের ধনুক শর সবাকার হাতে।

থানাদার খানসামা-কাজির সাত হাজার সওয়ার

বিশাশয় কামানে সাজে বড় বড় গোলা,
দাম দুম শব্দ শুনি চঞ্চলা অচলা।

তা ছাড়া সর্দ্দার-সিফাই সাজে বাহাদুর খাঁ, ও 'সাজিল হাতির পিঠে বংগ মিয়া কাজি।' সামন্ত রাজারাও এলেন – বর্ধমানের কালিদাস, ধলভূম ও মল্লভূমের রাজারা, এমন কি রাজপুরোহিত বিনোদ ঘোষালও।

সাজিল আগরি ভুঞা দক্ষিণ হাজরা
আট হাজার ঢালি সংগে যেন খসে তারা।

এল বাগদি গজপতি যে 'আপুবলে হানা দেই নাই মানে বিধি।' হাড়ি-ডোমের 'পায়ে বাজে নূপুর, ঘাগর বাজে ঢালে।' মাজিয়া-র 'যমের সমান' রানা-ঢালিরা 'টেড়ি কর্য়া পাগ বান্ধে' আর ইন্দু মিঞা খোন্দকারের পেছনে 'রানা পাইক দেখা দিলে রক্ষা আছে কার।' আর সব শেষে জয় ঢোল বাজিয়ে এল ভুঞা কোলের দল :

চিকুরে চিরণি আছে অংগে রাংগা মাটি,"
জাত্যের স্বভাবে তীর ধরে দিবারাতি।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মল্লভূমির রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ধর্মমংগল কাব্যেও বর্ণনা পাওয়া যায় :

উটের উপরে বাজে টমক নিশান ;...
গজপৃষ্ঠে ধাং ধাং বাজে জোড়া দাম...

হরিপালের সাজি আইল কালিদাস বুড়া,
বাঁটুলে ভাঙিতে পারে দেউলের চূড়া।...

লম্পট ফাঁসুড়ে কত গাঁটকাটা চোর
বার কাহন সাজিল ভূতালে গাঁজাখোর।

ভারতের তথা বাংলার ইতিহাসে মুসলমানের আবির্ভাব একটা আকস্মিক ও অকারণ ব্যাপার নয়। কতকগুলো আভ্যন্তরীণ কারণেই এটি প্রধানত সম্ভব হয়। প্রাচীন যুগের জীবনধারা মোটামুটি একই খাতে বয়ে চলে নির্জীব হয়ে আসছিল এবং তারই লক্ষণ দেখা দিয়েছিল সমাজের সর্বাংগীন ভাঙনে। তা না হলে মুসলমানের আবির্ভাব কয়েকটা খণ্ড অভিযানেই শেষ হয়ে যেত, ভারতের মাটিতে মুসলমান সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। মুসলমানের আগেও আর্য শক গ্রীক কুষাণ হুণ প্রভৃতি বহু জাতি এসে ভারতের আদিম অধিবাসী-দের বিপর্যস্ত করেছে। আর্যদের সংগে অনার্যদের বিরোধ হিন্দু-মুসলমান বা ইংরেজ-ভারতীয় বিরোধের চেয়ে কোনো অংশে কম তীব্র ও মর্মান্তিক ছিল না। এদের প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য ছিল—আর্য শক হুণ কুষাণ ইত্যাদির। কিন্তু সমন্বয়ের মধ্যে বিরোধী স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে যে এই সমন্বয় একদিনে হয়নি, বহু শতাব্দী লেগেছে। হিন্দু বৈশিষ্ট্য ও মুসলিম বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ সমন্বয় মধ্য যুগের পাঁচ শো বছরে ঘটে ওঠেনি। তারপর আধুনিক যুগের দু শো বছরে তৃতীয় পক্ষের চক্রান্তের জন্য সেই সমন্বয়ের সম্ভাবনা নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে মুসলমান মধ্য প্রাচ্যের কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিনিধি হয়ে এ দেশে আসেনি, স্বদেশের সংগে বিশেষ কোনো যোগসূত্রও রাখেনি। ভারতের তথা বাংলার মাটিতে সে দেশী আবহাওয়ার মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে। বিবাহ ও ধর্মান্তরগ্রহণের সূত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের রক্তের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রয়েছে। পার্থক্য আছে ধর্ম সংস্কৃতি ও সামাজিক

প্রথায়, কিন্তু সারা মধ্য যুগে এসব ব্যাপারেও প্রচুর সমন্বয় হয়েছিল। তা ছাড়া জল মাটি সাহচর্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক দেশজ (সাম্প্রদায়িক নয়) প্রথা ইত্যাদির ফলে মনে ও জীবনযাত্রায় পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্যই বেশি। বিদেশীরা তাই 'হিন্দু' বলতে 'ভারতীয়' বোঝে; মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশেও 'মুসলিম হিন্দু' মানে 'ভারতীয় মুসলিম।'

মোগল যুগের শেষ দিক আলোচনা করলে দেখি যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দ্রুতবর্ধমান দুর্বলতা বাংলাকেও দুর্বল করে ফেলছে। মারাঠাদের উত্থান, বিদেশী বণিকদের চক্রান্ত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর্থিক শোষণ ও সমাজের ভাঙন সিরাজের যুগকে অন্তঃসারহীন করে তুলেছিল। মোগলদের বিরাট কীর্তির পেছনে রয়েছে অনেক দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার, দুর্নীতি ও শোষণের দীর্ঘ ইতিহাস। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত তখনকার দিনে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ইংরেজকে সহায়তা করার ব্যাপারে তাই বিস্মিত হবার কিছু নেই। গোলামির জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে এ চক্রান্ত হয়নি, তাহলে পরে মীর কাশিমের সংগে ইংরেজদের সংঘর্ষ হত না; অভাব ছিল স্বার্থান্ধ নেতাদের দূরদর্শিতার। পোর্তুগীজদের সংগে বারভুঁইয়াদের স্বার্থের খাতিরে যেমন চুক্তি হত, ঠিক তেমনি ব্যাপারই হয়েছিল সিরাজের বিরুদ্ধে। সিরাজের ওপরে আক্রোশ ছিল একাধিক নেতার একাধিক কারণে—জগৎ শেঠ, মীর জাফর। ঘসেটি বেগমের দায়িত্বও কম নয়। পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর বীরত্ব ও বুদ্ধির অভাব ছিল না, ছিল ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির। এই চক্রান্তের ফলে ইংরেজের শক্তিবৃদ্ধি ও জাতির বিপদ ঘটতে পারে এ কথা নাকি শুধু এক রাণী ভবানীই ভেবেছিলেন, সন্তানবয়সী সিরাজকে তিনি একাই বোধ হয় ক্ষমা করেছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের নাটকীয় পরিণতি হল ইংরেজদের দেওয়ানি-লাভে। কিন্তু তখনো যে চেতনা হয়নি এবং কোনো যৌথ

প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়নি তা থেকেই বোঝা যায় যে বাঙালীর নৈতিক জীবন কতো নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল।

আধুনিক যুগ

ইংরেজ এসেছিল বণিকের মূর্তিতে, যোদ্ধার নয়। ভারতের মাটিতে সে বাসিন্দা হয়নি, কর্মজীবনের শেষে সে ফিরে গেছে তার দ্বীপের দেশে। শোষণরিক্ত ভারতের মানবিকতাকে অপমান করে স্বদেশকে করেছে সে স্ফীত ও সাম্রাজ্যগর্বে দৃপ্ত। রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে এ দেশের রক্তে অনেক ইংরেজই মিশে যেত, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ সম্প্রদায় হয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বিদেশী প্রবাসী হিসাবে সে থেকেছে এ দেশে, অথচ আমাদের ফসলে সে ভরেছে তার নিজের গোলা। তাই এ মাটি করেছে বিদ্রোহ। ইংরেজের 'ভারত-ত্যাগ' এখনো সম্পূর্ণ হয়েছে কি-না তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই এখানে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই এসেছে ১৯৪৭এর ১৫ই অগস্ট্।

তবে ইংরেজ নিয়েছে যেমন অনেক কিছু, দিয়েছেও তেমনি অনেক কিছু। সে সৃষ্টি করেছে সংঘবদ্ধ জাতীয়তা, দিয়েছে সে আধুনিক মন। আমাদের ভুলের দাম ইতিহাস কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিয়েছে আজ দু শো বছর ধরে। কতো যে আমাদের জড়তা ছিল তা বুঝি তখন যখন ভাবি কী নিদারুণ আঘাতের ফলে আমাদের চেতনা এসেছে এতোদিনে, তাও অসম্পূর্ণ অবস্থায়। জাতির মর্মস্থানে দিনের পর দিন আঘাতে ধ্বংস হয়েছে অনেক কিছু, কিন্তু তার ফলে ইতিহাসেরও মোড় ফিরেছে নব বিপ্লবী ধারার পথে।

রাষ্ট্র ও রাজনীতির ধারা বিশ্লেষণ করে আধুনিক যুগকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা চলে : (১) ১৭৬৫ থেকে ১৮৫৭ ; (২) ১৮৫৭ থেকে ১৯১২ ; (৩) ১৯১২ থেকে ১৯৪৭।

১৭৬৫-১৮৫৭ : ১৭৬৫ সালে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি নিলেন ক্লাইভ্। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি এসেছিল এ দেশে বাণিজ্যের জন্য, এখন পেল শাসনভার। এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা যে কোনো দেশের ইতিহাসেই বিরল। অবশ্য প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় শাসনের চেয়ে লুণ্ঠন ও অর্থনৈতিক শোষণের ওপরেই নজর ছিল বেশি। ভারতে বা বাংলায় সেটা ছিল মাৎস্যন্যায়ের যুগ, আর সেই সুযোগে চক্রান্ত ও সামরিক শক্তির দ্বারা ইংরেজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল রাজ্যবিস্তারের পথে। শাসনভারের দায়িত্ব গ্রহণ করা কোম্পানির অভিপ্রায় ছিল না। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট্ পাশ হবার পর এবং বিশেষত ১৭৮৪ সালে শাসনব্যবস্থায় ইংরেজ হস্তক্ষেপ করল। হেষ্টিংস্ হলেন প্রথম গভর্ণর্-জেনারেল্। কলকাতাকে রাজধানী করে ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তার করে চলল। ১৮২৬ সালে আসাম দখল উল্লেখযোগ্য, কারণ এর ফলে সম্পূর্ণ পূর্বভারত ইংরেজের হাতে এল এবং সারা পূর্বভারতের জীবনকেন্দ্র হল কলকাতা। কোম্পানির যুগ শেষ হল ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহের সংগে। বাংলা দেশের ব্যারাক্‌পুরেই বিদ্রোহ শুরু হয় ও পরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালীর স্থান সামান্য; বরং বাংলার মধ্যবিত্তেরা ও প্রতিপত্তিশালী লোকেরা এ বিদ্রোহে বিশেষ কোনো সহানুভূতি দেখাননি। এ বিদ্রোহের মূলে খানিকটা জাতীয় চেতনার আভাস থাকলেও আসলে এটি ছিল ভারতীয় সামন্তবর্গ ও ধনপতিদের প্রভুত্ব ফিরে পাবার প্রয়াস। কিন্তু এ ব্যাপারেও ঘটল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্বার্থবিরোধ; ফলে বিদ্রোহ হল বশ্যতা।

১৮৫৭—১৯১২ : ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বে অনেক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হলেও কোম্পানির দুর্নীতি বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া এই বিশাল দেশকে ভালো ভাবে শাসন করা

একটি ব্যবসায়ী দলের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে নানা কারণে দেশব্যাপী অসন্তোষ প্রকাশ পেল সিপাহী বিদ্রোহে। তা ছাড়া বিলাতী ধনপতিদের দল চাইল ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতকে ছিনিয়ে নিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে শোষণ করতে। তাই ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় কোম্পানি-শাসন শেষ হয়ে আরম্ভ হল পার্লামেণ্টের অধীনে খাঁটি ব্রিটিশ শাসন ১৮৫৮ থেকে। ১৮৭৪ থেকে আসাম আলাদা হয়ে গেল বাঙালী-অধ্যুষিত শ্রীহট্ট ও কাছাড় নিয়ে। ১৮৮৫র ঐতিহাসিক ঘটনা কংগ্রেসের জন্ম। জাতীয় চেতনাবৃদ্ধির সংগে আসে ১৯০৫র বংগবিভাগ —পূর্ব ও পশ্চিম, পদ্মার এপার ওপার। বাহ্যত শাসনের সুবিধার জন্য বিভাগ হলেও, আসল উদ্দেশ্য ছিল নবজাগ্রত বাংলার রাজনৈতিক চেতনাকে নির্জীব করে দেওয়া। কিন্তু ফল হল বিপরীত, রাজনৈতিক আন্দোলন হল সন্ত্রাসবাদ। ১৯০৯র মর্লি-মিণ্টো শাসনসংস্কার পরিবর্তন আনলেও পুঞ্জিত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করতে পারেনি।

১৯১২-১৯৪৭ : ১৯১২ থেকে পঞ্চম জর্জের ঘোষণানুযায়ী বংগ-বিভাগ রদ হল বটে, কিন্তু বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর নিয়ে আর একটি প্রদেশের সৃষ্টি হল আর সেই সংগে গেল মানভূম-ধলভূমের বাঙালী অঞ্চল। আর এক পরিবর্তন হল : কলকাতা থেকে রাজধানী গেল দিল্লিতে। বাইরের ব্যাখ্যা যাই হোক, এই পরিবর্তনগুলির প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাকে শাস্তি দিয়ে ভারতের নব জাগৃতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। ১৯১৪-১৮র প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে রাষ্ট্রীয় অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাকে শান্ত করবার জন্যই প্রবর্তিত হল দ্বৈতশাসনরীতি। ১৯৩১র 'সাম্প্রদায়িক দান' ও 'গোল টেবিল' রাজনীতি ইংরেজ শাসনের আর এক পর্যায়। ১৯৩৯র যুদ্ধ আর বিক্ষোভ জন্ম দিল ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাবের আর

তারই ব্যর্থতা আনল ১৯৪২র ভয়ংকর অগস্ট্ বিপ্লব। যুদ্ধের শেষে ভারতত্যাগের সিদ্ধান্ত হলেও মতদ্বৈধ চলল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিয়ে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ আর মুসলিম্ লীগের পাকিস্তান-দাবির জন্যই মন্ত্রি-মিশনের আয়োজন ব্যর্থ হল। ১৯৪৬এর ১৬ই অগস্ট্ বাংলার ও ভারতের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের 'প্রত্যক্ষ' সংগ্রামের রক্তাক্ত দিন, জাতীয়তার চরম ও শোচনীয় পরাজয়। আর তারই অনিবার্য ফল হল খণ্ডিত ভারতের ও খণ্ডিত বাংলার অসম্পূর্ণ স্বাধীনতা—১৫ই অগস্ট্, ১৯৪৭। ইংরেজী শাসনের শেষ পর্ব শুরু হয়েছিল বংগবিভাগ রদ করে; ইংরেজী শাসন শেষ হল বংগবিভাগকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে।

ইংরেজী শাসনের প্রথম পর্বে সারা ভারতের জাগৃতির ভিত্তি গড়ে উঠল বাংলায়; দ্বিতীয় পর্বে বাংলায় সেই জাগৃতির পূর্ণ বিকাশ সারা ভারতকে করল সচেতন; তৃতীয় পর্বের প্রথম দিকে ১৯২৫ পর্যন্ত ভারত ও বাংলার চিন্তা-ও-কর্মক্ষেত্রে আদানপ্রদানের যুগ; তার জের চলল ১৯৩১ পর্যন্ত; কিন্তু ১৯৩১র পরে ভারতের জীবন থেকে বাংলার জীবন আলাদা হয়ে গড়ে উঠছে। গড়ে উঠেছে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর বিভিন্ন বামপন্থী বিপ্লবী মত।

লেনিন্ বলেছেন: 'ভারতে যে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের নাম ইংরেজী শাসন তার সীমা নেই।' একজন ইংরেজ (কর্ণ্ওয়াল্ লিউইস্) স্বীকার করেছেন: 'পৃথিবীর ইতিহাসে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো এমন দুর্বৃত্ত ও বিশ্বাসঘাতক শাসকসম্প্রদায় কখনো দেখা যায়নি'। বাংলাই শোষিত হয়েছে সব চেয়ে বেশি। ১৭৭০ থেকেই বাংলায় বিক্ষোভ শুরু হয়। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ ও শেষে নন্দকুমারের ফাঁসী স্বাধীনতা-আন্দোলনের সূত্রপাত করে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে (যার ছবি বংকিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ') দস্যু-তস্করের উপদ্রব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ১৮৫৯-৬০এর নীলকর

আন্দোলন (যার ছবি দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ') অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণবিদ্রোহের সূচনা করে।

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজ হিউম্। উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধারা চালিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক অসন্তোষ দূর করা। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমেই জাতীয়তার চেতনা শুরু হল বাংলায়—আধুনিক ভারতে বাংলার শ্রেষ্ঠ অবদান। 'আন্দোলন'-রীতির জন্ম ১৯০৫ সালে আর তার প্রথম ফল ইংরেজ-বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদ। এই সন্ত্রাসবাদ যে পন্থাই নির্দেশ করুক না কেন, জাতির মেরুদণ্ডকে যে খানিকটা দৃঢ় করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

> কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোর যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন সমস্ত মাড়োয়াড়ে তাঁর চেয়ে অকল্যাণের মূর্তি আর কোথাও ছিল না। সে আজ কত শতাব্দের কথা—তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়ে বড়ো হয়ে আছে। পরাধীন দেশের মুক্তিযাত্রায় পথের আবার বাচবিচার কি ? — শরৎচন্দ্র : 'পথের দাবী'

এই হল সন্ত্রাসবাদের মূল নীতি আর এরই জায়গায় গান্ধিজী আনেন অহিংস অসহযোগের, সত্যাগ্রহের পন্থা। আবির্ভাব হল 'স্বরাজ' দলের। স্বরাজে জন্মসত্ব ঘোষণা করলেন চিত্তরঞ্জন। তারপরেই ইংরেজী চক্রান্তে আরম্ভ হল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। ১৯৩০র কংগ্রেসী আদর্শ হল পূর্ণ স্বাধীনতা ; তারই উত্তর এল ১৯৩১র সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায়। বাংলার ইতিহাসে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় ঘটল : সাম্প্রদায়িক শাসন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, বংগবিভাগ। ১৯৪২ সালে বাঙালী বিদ্রোহ করেছিল ; মেদিনীপুরের গণ-বিদ্রোহ ভোলবার নয়। ১৯৪১এর শেষ দিকে ভারতের বাইরে ইংরেজের বিরুদ্ধে আরম্ভ হল মুক্তি-সংগ্রাম বাঙালী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে।

আপাতদৃষ্টিতে ভারতের বাইরে এই মুক্তি-সংগ্রাম হয়তো ব্যর্থ বলে মনে হবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ যুগের ঐতিহাসিকেরা বিচার করে দেখবেন যে ভারতের স্বাধীনতালাভের মূলে এই সংগ্রামের প্রভাব কতোটা ছিল। যে কার্য-কারণের ধারাচক্রে স্বাধীনতা এসেছে তার মধ্যে একটি প্রধান স্থান রয়েছে এই সংগ্রামের, যদিও বর্তমানে কোনো কোনো নেতা হয়তো এ কথা অস্বীকার করবেন।

> তোমাদের রণধ্বনি হোক: দিল্লি চলো, চলো দিল্লি।... শেষে জয়ী আমরা হবোই। ...তোমাদের এই আশ্বাস দিলাম যে আলোয় বা অন্ধকারে, দুঃখে ও হর্ষে, শোকে ও জয়গর্বে আমি তোমাদেরই সাথী হবো। আজ তোমাদের কাছে দেবার মতো আমার কিছুই নেই; আছে শুধু ক্ষুধা আর তৃষা, দুর্গম পথ আর অজস্র মৃত্যু। ...তোমরা একটি পতাকা ঘিরে দাঁড়াও, ভারতের মুক্তির জন্য আঘাত হানো। .. দূরে, বহুদূরে নদ-নদী ছাড়িয়ে, অরণ্য-পর্বত ছাড়িয়ে ঐ আমাদের মাতৃভূমি। ...দেখ, তোমাদের সামনে স্বাধীনতার পথ। ...ভগবান যদি চান আমরা শহিদের মতো মৃত্যু-বরণ করব। যে পথ ধরে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লিতে পৌঁছবে, শেষ শয্যা গ্রহণ করবার সময়ে আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করে নেব। দিল্লির পথই স্বাধীনতার পথ—চলো দিল্লি।

কিন্তু দিল্লিচলার এই মহা অভিযানের পথে বাধা দিয়েছিল '৪৬-এর 'প্রত্যক্ষ' সংগ্রাম। তাই লক্ষ সমস্যার মধ্যে জন্ম নিল, '৪৭-এর ১৫ই অগস্ট। বাংলার দুর্ভিক্ষ, বাংলার দাংগা, বাংলাবিভাগ—বাঙালীর জীবনে ইংরেজের শেষ কীর্তি।

৩ : সমাজের রূপ ও রূপান্তর

ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজের রূপ ও রূপান্তরের দীর্ঘ ধারায় একটা অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, আর তার পরিচয় মেলে গ্রাম্য সমাজে। অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে অনেক এবং নানা কারণে বাঙালী সমাজের বৈশিষ্ট্যও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশেষত ইংরেজী আমলে।

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন সমাজের মূল সূত্রগুলি কী? জৈমিনি বলছেন : 'রাজা জমির মালিক নন ; মালিক তারা যারা চাষ করে।' সায়নাচার্যেরও একই কথা অর্থাৎ রাজার শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকার, জমির আসল মালিক চাষী। ফলে সমাজ হল মূলত কৃষিপ্রধান ও পল্লী-কেন্দ্রীয়।

আর একটি বৈশিষ্ট্য কাল্ মার্ক্সের মতে : 'সহজ সরল অর্থনৈতিক উৎপাদনরীতির পুনরাবর্তন হচ্ছে এই আত্মনির্ভরশীল গ্রাম্য সমাজের বিশেষত্ব।..... রাজ্য ও রাজবংশের অফুরন্ত ভাঙা-গড়ার মধ্যে সমাজের নিশ্চলতা ও স্থিরতা বিসদৃশ লাগে।' ছোট ছোট গণতন্ত্রের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণতাই ছিল গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য এবং এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রামও গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় নগরগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে সেগুলি সাধারণত তীর্থস্থান ও রাজবসতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে ; বাণিজ্যের বন্দরকে কেন্দ্র করে গঠিত শহরের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' সুরক্ষিত মগর ও নগরপরিকল্পনার যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে তা থেকে

প্রদেশের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রথা প্রচলিত ছিল। নগরবাসিনীদের পরণে সূক্ষ্ম বসন, বাহুতে সোনার তাগা, মাথায় তৈলসিক্ত চূড়াকবরী আর ফুলের মালা থাকত। নাগরিক চালচলন সরল গ্রাম্য লোকদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকে একটি মেয়ে আর একটিকে বলছে :

> সখি, সোজা পা ফেলে চল আর নাগরিক আচার ছাড়। এখানে আড় চোখে তাকালেও গাঁয়ের মোড়ল ডাইনী বলে শাস্তি দেয়।

এর সংগে শরণের একটি শ্লোকের তুলনা চলে বেলাশেষে চাষী মেয়েদের একটি অপরূপ ছবিতে :

> ছুটে চলেছে মেয়েরা— তাদের কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়েছে আর তা তুলে দেবার জন্য তাদের যা আগ্রহ! সকালে চাষী বেরিয়ে গেছে আর এখন ফেরবার সময় হল ভেবে এরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে আঙুল গুণে হাটে কেনাবেচার হিসাব করে।

প্রাচীন যুগের বৌদ্ধ চর্যাপদে সেকালের সাধারণ ও দরিদ্র লোকদের জীবনের ভগ্নাংশ চিত্র মেলে। অস্পৃশ্য ডোমেরা সাধারণত সহরের বাইরে বাস করত; তাদের জীবিকা ছিল বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করা আর তাঁত-বোনা। পরণে বস্ত্রের অপ্রাচুর্য থাকলেও এদের মেয়েরা সাজসজ্জা করত বেশ — ময়ূরপুচ্ছের সাজ, গুঞ্জাফলের মালা, ফুলের মালা। শৈব ও বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনায় যোগিনী বা অবধূতীকে সংগিনীরূপে গ্রহণ করত। এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ ও নীচ জাতির লোকই ছিল বেশি। চর্যাপদে এদের সাধনার সাংকেতিক পরিচয়ের সংগে সামাজিক জীবনেরও ছবি পাওয়া যায়। নীচ জাতিদের কয়েকটি বৃত্তি ছিল — মদ-চোয়ানো, নৌকা ও সাঁকো গড়া, নৌকা চালানো, হাতি পোষা, শিকার, জুয়াখেলা, তুলাধোনা, মুখোসপরা নটের

নৃত্যগীত। সাধারণত অর্থস্বাচ্ছল্য থাকলেও প্রাচীন যুগেও দরিদ্র বাঙালীর 'হাঁড়িত ভাত নাহি।' নিম্ন বংগে নীচ জাতির বসতিই বেশি ছিল এবং সেখানে বিয়ে করা নিন্দনীয় বলে মনে করা হত। এই নিম্ন বংগকেই তখন 'বংগ' বলা হত এবং এখানকার অধিবাসীদের বলা হত 'বাঙালী' :

আজি ভুসুকু বঙালী ভৈলি।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলি॥
(আজ, ভুসুকু, তুই বাঙালী হলি ; চণ্ডালীকে নিজ ঘরণী করলি।)

প্রাচীন সাহিত্যে হাজার বছর আগে শীতারম্ভের দিনে বাংলার ছবি :

চাষীদের ঘরে ধানের স্তূপ ; কচি যবের অংকুরের সংগে নীলপদ্মের যোগে ক্ষেতের সীমা যেন বেড়ে গেছে। গোরু ষাঁড় ছাগল ঘরে ফিরে নতুন খড়ে তৃপ্ত ; আখমাড়াই কলের শব্দে গ্রাম মুখর আর নতুন গুড়ের গন্ধে আকুল।

পল্লীবাসী বাঙালী গৃহস্থের ছবি পাওয়া যায় শুভাংকের বর্ণনায় :

গৃহকর্তা নির্লোভ, ধেনুতে গৃহ পবিত্র, উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাষ, গৃহিণী অতিথিসৎকারে অক্লান্ত।

কিন্তু দারিদ্র্য ছিল না ? ছিল আর তারও নিখুঁত ছবি মেলে সংস্কৃত শ্লোকে :

দেহ শীর্ণ, বস্ত্র জীর্ণ ; ক্ষুধায় আকুল শিশুরা আহার চায় আর দীন গৃহিণী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। জীর্ণ গাড়ুতে এক ফোঁটা জল ধরে কিনা সন্দেহ। গৃহিণী কাতর হাসি হেসে ছেঁড়া কাপড়টুকু সেলাই করবার জন্য বিরক্ত প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে স্থচ চাইছেন।

কোনো সময়েই এমন সমাজব্যবস্থা ছিল না যার ফলে দারিদ্র্য ও অবিচারের লোপ ঘটে। পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে বিদ্রোহের প্রয়োজন হয় তার মতো যথেষ্ট ঐতিহাসিক শক্তিও সঞ্চিত হয়নি।

মধ্য যুগ

প্রাচীন বাঙালী সমাজের মূল ধারা মধ্য যুগে প্রায় অব্যাহত থাকলেও বাহ্য পরিবর্তন হয়েছিল প্রচুর। গ্রাম্য সমাজ মোটামুটি পুরানো পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে চলেছিল। প্রাচীন যুগের মতো মধ্য যুগেও সামন্ত রাজাদের স্থানীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিদেশীর অভিযানে রাজধানীতে বিপর্যয় উপস্থিত হত, গ্রাম্য জনসাধারণও অল্প-বিস্তর বিব্রত হত। কিন্তু শহর থেকে অনেক দূরে ছড়ানো গ্রাম-গুলোয় এই বিপর্যয়ের ঢেউ সমাজভিত্তিকে টলাতে পারেনি। তা ছাড়া মুসলমানেরা কোনো স্পষ্ট পৃথক সামাজিক ধারণা নিয়ে আসেনি; তারা এসেছিল বিজয়-অভিযানে এবং তার পর এখানে বসতির সময়ে প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মধ্য প্রাচ্য থেকে ভাগ্যান্বেষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির আগমন হলেও মূল সমাজব্যবস্থায় কোনো আপত্তি হয়নি— পাঠান যুগে তো নয়ই।

নতুন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল বটে আর তার ফলে বাহ্য জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন বৈচিত্র্য ও সমন্বয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগেও এ রকম ব্যাপার বহু হয়েছিল, যদিও সেই দীর্ঘ লুপ্ত ইতিহাসের সামান্যই আমরা জানি। নতুন নতুন শহরের আবির্ভাব, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশীদের আগমন, দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ও নানা রকম আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সময়ের স্রোতে জীবনযাত্রার উন্নতি বা অবনতি— এ সবেরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রাচীন কাল থেকে খানিকটা পার্থক্য তো দেখা দেবেই। কিন্তু নতুন কোনো ভাবসংঘাতে ভিত্তিনাশী সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়নি। তা যে হয়নি আজো তার

প্রমাণ রয়েছে পল্লীসমাজের এমন অনেক লক্ষণে যেগুলোর বয়স প্রায় হাজার বছর।

১৪০০ থেকে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সামন্তপ্রথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তার পর অর্থাৎ মোগলযুগে অবশিষ্ট ভারতের সংগে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ, তোডর মল্লের নতুন সামন্তসৃষ্টি, বাণিজ্যের প্রসারে বণিকশ্রেণীর প্রভাব, মগ-ফিরিংগি-বর্গির হাংগামায় দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষতি, য়ুরোপীয় বণিকদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবিস্তার —এগুলোর ফলে কিছু কিছু পরিবর্তন হলেও সমাজের কাঠামো বদলায়নি। নতুন কারুকার কিছু গজিয়ে উঠছিল জীবনযাত্রার নতুন তাগিদে। কিন্তু বিজ্ঞান ও গুরুশিল্পের যুক্তবিপ্লব এ যুগে ঘটেনি; নগরীর অভাব না থাকলেও মহানগরী ছিল না।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা মধ্য যুগের সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাঠানবিজয়ের পর মুসলমানেরা

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিরা খায় রঙ্গে,
পাথড় পাথড় বোলে বোল।

হিন্দুরা স্তম্ভিত। বৌদ্ধেরা কেউ পালিয়ে বাঁচে, কেউ বা এই কথা বলে মুসলমান হয়ে যায় যে বৌদ্ধদের ওপরে হিন্দুদের অত্যাচারের পাপেই 'ধর্ম হৈলা যবনরূপী।'

দেউল দেহারা ভাঙ্গে গো হাড়ের ঘায়
হাতে পুথি কর্যা কত দেয়াসি পালায়।

বিদ্যাপতি লিখেছেন তাঁর 'কীর্তিলতা'য়:

হিন্দু তুরকে মিলল বাস।
একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ মিলিমিস, কতহুঁ ছেদ।

হিন্দুর জাতিভেদ আর মুসলমানের ঐক্য হিন্দুরা বিশেষ লক্ষ্য

করেছিল। রূপরাম লিখছেন: 'এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়।' বিদ্যাপতির অভিযোগ এই যে এরা ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর রাং, এরা ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে। বিদ্যাপতি আরো বলেন যে 'বিনু কারণহি কোহাএ বএন তাতল তমুকুত্তা' অর্থাৎ বিনা কারণেই রাগে এদের মুখ হয় তপ্ত তামার মতো লাল। এরা আড় চোখে চায়, দাড়ি আঁচড়ায় আর থুথু ফেলে। বিজয়গুপ্ত ও জয়ানন্দ বলেন যে ব্রাহ্মণ দেখলেই তার পৈতা ছিঁড়ে মুখে থুথু ফেলা এদের যেন একটা অভ্যাস। মুকুন্দরামের দুঃখ এই যে এরা 'ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মোছে হাত।' কিন্তু তা হলেও তিনি কালকেতুর মুসলমান প্রজাদের সুখ্যাতি করেছেন:

ফজর সময়ে উঠি বিছায় লোহিত পাটি
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ। ... ..
বড়ই দানিশমন্দ কারে নাহি করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ মাথায় না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।

এদের মধ্যে 'কেহ নিকা কেহ করে বিয়া'; মোল্লারা 'দোয়া করে কলমা পড়িয়া।' এরা হল তাঁতী, কামার, জেলে ইত্যাদি; আবার 'কাণ হয়ে মাংগে কেহ পায়া নিশাকাল,' কেউ বা 'নিরন্তর মিথ্যা কহে, নাহি রাখে দাড়ি।'

মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের কারো কারো মুসলমানী আচার দেখে গোঁড়া হিন্দুরা দুঃখ করত:

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে
মসনবি আবৃত্তি করিবে কোন জন।......

মুসলমানদের মধ্যেও এ রকম ভাব ছিল। যবন হরিদাসের হিন্দু আচার লক্ষ্য করে মুসলমান শাসনকর্তা তাঁর ওপরে ভীষণ অত্যাচার

করে কারণ 'মহাবংশজাত' অর্থাৎ মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর আচরণ অসহ্য :

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার।......
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত
তাহা বুঝি ছাড় হই মহাবংশজাত।

মুসলমান যুগের প্রথমে ও পরে মাঝে মাঝে দুর্বৃত্তদের দ্বারা যথেষ্ট অত্যাচার হলেও হিন্দুর ধর্মকর্মে মুসলমান শাসকেরা মোটামুটি হস্তক্ষেপ করেননি। অনেক সময়ে হিন্দুর দিক থেকে মেলামেশা ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কে আপত্তি থাকায় মুসলমানেরা অপমানিত বোধ করে উত্তেজিত হয়ে অনেক অত্যাচার করেছে। তা ছাড়া ধর্মবিরোধ হিন্দু-বৌদ্ধের মধ্যেও প্রাচীন যুগে ছিল, আর মধ্য যুগে তো ধর্মবিরোধ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। মুসলমানেরা সব সময়ে তুর্কী পাঠান বা মোগল ছিল না ; তাদের মধ্যে ধর্মান্তরিত হিন্দু ও তাদের বংশধরেরাও ছিল। ধর্মান্তরগ্রহণও অনেক সময়েই হিন্দুদের সামাজিক অনুদারতার ফলে হয়েছিল। এই সব ব্যাপার সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্পর্কে যথেষ্ট প্রীতি ছিল। শ্রীচৈতন্য একবার ক্রুদ্ধ হলে কাজি তাঁকে শান্ত করবার জন্য বলেছিলেন :

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা,
দেহ সম্বন্ধে হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা,
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।

আবার শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ পেল শ্রীবাসের মুসলমান দরজি :

শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন,
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন।

সারা মধ্য যুগটা ধরে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ দেশে বসতি করবার পর মুসলমানেরা বহু হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করেছে, আবার অনেক মুসলমান মেয়েও হিন্দুকে বিবাহ করেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের উদারতার অভাবে ইচ্ছা থাকলেও মুসলমানের পক্ষে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে হিন্দুই মুসলমান হয়েছে আর অনেক বৌদ্ধও মুসলমান হয়েছে। পিতৃকুল, মাতৃকুল বা উভয়কুল থেকেই হিন্দু রক্ত বাংলার মুসলমানের দেহে বিদ্যমান। উচ্চ বর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণ বংশের বহু হিন্দু পুরুষ ও নারী মুসলমান অভিজাত বংশের সৃষ্টি করেছে। এই রক্তমিশ্রণ ও নিম্নজাতির দলগত ভাবে ধর্মান্তরগ্রহণের ফলে বাংলার মুসলমান বাংলার হিন্দু থেকে একটা পৃথক জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। অভারতীয় ও অবাঙালী মুসলমানের বংশধারা বাংলায় নগণ্য। তাই ম্যাক্‌ফার্লেন্ রক্ত পরীক্ষা করে বলেছেন যে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি নয়, রক্তের কোনো প্রভেদই নেই।

১৮৭২ সালের লোকসংখ্যাগণনার বিবরণীতে লেখা হয়েছে :

> মুসলমানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করে তখন এখানকার হিন্দুধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল।.. নিম্নবর্ণের লোকদের গোলামে পরিণত করা হয়েছিল।...ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ অত্যাচারের প্রয়োজন হয়নি। বিহারে ইসলামের প্রসার বন্ধ হয় হিন্দুত্বের প্রতিরোধে, কিন্তু বাংলার সে শক্তি ছিল না।.. নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সংগে বাংলার মুসলমানদের চেহারার সাদৃশ্য বোঝা যায়।

সেনেদের অবাঙালী কৌলীন্যপ্রথা ও জাতিনিপীড়ন বাঙালী জনসাধারণকে বিব্রত করেছিল। এঁদেরই নিমন্ত্রিত কনৌজী ব্রাহ্মণদল বৌদ্ধ ও নিম্নজাতির ওপরে বিধিনিষেধ জারি করে। শোনা যায় বাংলায় মাত্র সাত শো ঘর ব্রাহ্মণ ছিল বলেই এঁদের আগমন হয়। পরে দেবীবর ঘটকের শ্রেণীবিভাগ ব্রাহ্মণদের আবার ছত্রভংগ

করে দেয়। আচারবিচারের কঠোরতা, অন্তর্বর্ণবিবাহের লোপ, ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত ও অন্যায় প্রাধান্য, নিম্নশ্রেণীর ওপরে সামাজিক গুরুভার ইত্যাদির ফলে হিন্দু সমাজের দুর্বলতা বেড়ে চলেছিল প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত। এই অবাঙালী সমাজপ্রথা বার বার সংশোধন করা হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রথা বাংলার দ্রুতপরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজন ও দাবি মেটাতে পারেনি। তাই ধর্মান্তরগ্রহণ এত বেশি হয়েছে। এই জীর্ণ সমাজের বিরুদ্ধেই শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক বিপ্লব যাতে খাঁটি বাঙালিত্বের পরিচয় মেলে।

অভিযান ও অরাজকতার সমাপ্তির পর যখনই মুসলমানী শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখনই সমাজে হিন্দুর স্থান অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সংখ্যাতেও হিন্দুরা বেশি ছিল। শাসনভার সামরিক দায়িত্ব সংস্কৃতিচর্চা — কোনো বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয়নি, বরং মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রচুর পোষকতা ছিল। ইংরেজী শাসন আরম্ভ না হলে এতদিনে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক পার্থক্য দূর হয়ে জাতীয়তা গভীর ও ঘনিষ্ঠ ভাবে গড়ে উঠত। নানা কারণে সেই ব্যাপারটি যে ঘটে উঠছিল তা মধ্য যুগের সামাজিক ইতিহাস ব্যাপক ভাবে আলোচনা করলেই বোঝা যায়। লোক-সংস্কৃতি আচার-বিচার দেশজ প্রথা ও ভাষা ইত্যাদিতে এই সামাজিক ও জাতীয় সমন্বয়ের লক্ষণ স্পষ্ট। তাই ধর্মমংগল কাব্যের কবি বলছেন :

জাজপুরের দেহারা বন্দিব এক মন
যেইখানে অবতার হইল যবন।

তাই 'চৌধুরীর লড়াই'-গীতিকায় মুসলমান গায়ন বলছেন : 'বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।' পীর ও পীরস্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশ্বাস হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমভাবেই প্রবল ছিল এবং এখনো আছে

বিশেষত পল্লীগ্রামে অনেক হিন্দুর মধ্যে   সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে সীতারাম দাস লিখেছেন :

বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দারণে
দারা বেগ ফকির বন্দিব নিগাঞে
জোড়হাতে বন্দিব পাড়ুয়ার সুফী খাঞে।

সত্যনারায়ণ ও মাণিকপীর ইত্যাদি তো দুই সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পত্তি। হিন্দুরা যেমন মহরম পর্বে অংশ নিয়েছে মুসলমানেরাও তেমনি মংগলচণ্ডী ওলাইচণ্ডী শীতলা ও মনসার কাছে মানত করেছে, শিবের গাজন ও কালীপূজায় যোগ দিয়েছে। পীরের দরগায় শির্ণি, পীরের কাছে মানত, তাজিয়ায় ফুল দেওয়া হিন্দুদের মধ্যে যেমন প্রচলিত আছে তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও গায়ে-হলুদ সিঁদুর ও আলতার ব্যবহার, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নবান্ন জামাইষষ্ঠী প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও অশৌচপালন প্রভৃতি প্রথা রয়েছে। তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক পরিবারে এমন সব আচারগত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় যা থেকে বেশ বোঝা যায় যে পূর্বপুরুষে নিশ্চয় কোনো রক্তমিশ্রণ বা অতিরিক্ত সাম্প্রদায়িক ঘনিষ্ঠতা ছিল। নাম ও পদবীতে তো অনেক সময়েই হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক স্পষ্টই বোঝা যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংকীর্ণতা ও ইসলামের দ্রুত প্রসারের ফলে ব্রাহ্মণ্যবিরোধী কয়েকটি ধর্মমতের উদ্ভব হয়। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মও নানা ভাবে আত্মপ্রকাশের আয়োজন করে। এই সব বিভিন্ন মতের পোষকেরা নিজ নিজ সমাজ ও রীতিনীতি প্রচলন করেন। এক দিকে কঠোর আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর অপর দিকে বিজয়ী ইসলাম— এই দুয়ের মধ্যে যৌথ সামাজিকতার ভিত্তি রচিত হয় এই সব মতের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব সহজিয়া বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায় মধ্য যুগের সামাজিক জীবনকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে যত রকমের আচার বা প্রথা প্রচলিত

আছে, তার প্রত্যেকটিই মধ্য যুগে ছিল। মুসলমানী আমলেই অবরোধপ্রথা এদেশে বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। নারীহরণ ব্যাপারে মুসলমানেরা দায়ী ছিল, কিন্তু পরে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা আতংকিত হয়ে উঠেছিল বিশেষত মগ ও ফিরিংগিদের অত্যাচারে। মোগল শাসনের শেষ দিকে বর্গির হাংগামাও ছিল। ফলে অবরোধপ্রথা ও নারীহরণের ধারা মধ্য যুগ থেকেই আরম্ভ হয়েছে।

এ যুগের শেষ দিকে বাঙালী সমাজে আবির্ভাব হল বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের। কিন্তু সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রভাব দেখা যায় মগ আর ফিরিংগিদের। অবশ্য এ প্রভাব মূলত অত্যাচার ও রক্তমিশ্রণের ইতিহাস। জলপথে পোর্তুগীজ ফিরিংগি আর মগদের দস্যুবৃত্তির উৎপাতে সমুদ্রতীর ও অনেক নদীর দুই পাশের বাঙালী অধিবাসীরা অমানুষিক ভাবে নিপীড়িত হয়। সামন্ত রাজারা ও দিল্লির সম্রাট এদের সহজে দমন করতে পারেননি। এরা ছোট ছোট নৌকায় অতর্কিত ভাবে বাণিজ্য-জাহাজ ঘিরে ফেলে লুণ্ঠন চালাত কিংবা হঠাৎ হাট-বাজার উৎসব-সভা বা বিবাহ-ভোজে উপস্থিত হয়ে অত্যাচার করত। সামসুদ্দিন তালিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে এরা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষকে বন্দী করে হাতের পাতায় ছিদ্র করে সরু বেত ঢুকিয়ে বেঁধে জাহাজের পাটাতনের তলায় ফেলে রাখত। নিজেদের রাজ্যে এই বন্দীদের এরা নানা কাজে লাগাত, অনেক সময়ে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে ও মধ্য প্রাচ্যে বন্দীরা বিক্রীত হত। বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান এদের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়েছেন এবং বহু সৈয়দ মহিলা এদের দাসী বা উপপত্নী হয়েছেন। 'ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া ক্রনিক্‌ল্'-পুস্তিকায় লেখা আছে যে আরাকানের চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ লোক বন্দী বাঙালী বা তাদের বংশধর। এই মগ-ফিরিংগিরা তৎকালীন বাঙালীর

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কী যে দুর্যোগ এনেছিল, তার আভাস পাওয়া যায় 'নসির মালুম' ইত্যাদি পল্লীগীতিকায়। এদের গায়ে থাকত লাল কোর্তা, মাথায় নানা রঙের পাগড়ি আর হাতে দূরবীন। বাঙালী বণিকের বাণিজ্যযাত্রা প্রসংগে ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম বলেছেন যে গংগার মোহনায় ফিরিংগি জলদস্যুদের আড্ডা ছিল বিশেষ ভয়ের স্থান :

> ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে ;
> রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে।

নরসিংহ বসু লিখেছেন :

> তমোলুক দক্ষিণে সম্মুখে সোনজড়া,
> রাতারাতি পার হৈল ফিরিঙ্গির পাড়া।

মগেদের সংস্পর্শে এসে অনেক ব্রাহ্মণ পরিবার এখনো পতিত আছে, যেমন বিক্রমপুরের 'মগ' ব্রাহ্মণেরা। মগ ও ফিরিংগিদের আগমনে বাংলায় মিশ্র জাতিরও উৎপত্তি হয়েছিল। চট্টগ্রাম খুলনা ২৪ পরগণার উপকূল নোয়াখালি সন্দ্বীপ ঢাকা ও সুন্দরবন-অঞ্চলে মগ-ফিরিংগিদের অনেক বংশধর এখানে বাস করে। নির্বিচার ও অবাধ ব্যভিচারের ফলে ফিরিংগিরা কয়েকটি ব্যাধিও এ দেশকে দান করেছিল। বাংলায় খৃষ্টধর্মও এরা আনে।

দিল্লির সম্রাটের চেষ্টায় ফিরিংগিদের অত্যাচার অবশেষে দূর হয় বটে, কিন্তু অপহরণ ও ক্রীতদাসপ্রথা একেবারে দূর হয়নি। তার প্রমাণ জামোর্। সে ছিল একটি কালো পাগড়িবাঁধা মূর্তি—ফরাসী রাজসভায় মাদাম্ দ্যু বারির পোষা ভাঁড়। ফিরিংগি ডাকাতে তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাংলার কোন অনামা নদীর পারের গ্রাম থেকে। মাথায় পাগড়ি বেঁধে ভাঁড়ামি করে সে রাজারাণীর মন যোগাত। কিন্তু মনে ছিল তার প্রতিহিংসার আগুন।

ফরাসী বিপ্লবের নরমেধ যজ্ঞে ফরাসীর সংগেই আহুতি দিয়ে নেচেছিল এই বাঙালী ক্রীতদাস—জামোর্।

বছরের হিসাবে ব্যবধান বেশি নয়, কিন্তু তবু মধ্য যুগ থেকে আধুনিক যুগ অনেক দূরের পথ।

আধুনিক যুগ

প্রাচীন ও মধ্য যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক অখণ্ডতা—শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও। কিন্তু আধুনিক যুগে হয়েছে একটি স্পষ্ট পৃথক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব আর ইংরেজী আমল হচ্ছে এই মধ্যবিত্তেরই ইতিহাস। ১৮৮৯ সালের লোকসংখ্যা বিবরণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী (যেমন কেরানী উকিল-মোক্তার খুচরা দোকানদার ও ব্যবসায়ী শিক্ষক-অধ্যাপক ইত্যাদি) বেশ গড়ে উঠেছে, কিন্তু বিজ্ঞানসংক্রান্ত মধ্যবিত্ত (যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি) এল আরো পরে যন্ত্র ও বিজ্ঞানের ক্রমপ্রসারের সংগে। এই যন্ত্র-বিজ্ঞান ও শ্রম-শিল্পের যুক্ত প্রভাবেই অতীত সমাজের মুল ধারা থেকে বর্তমান বাংলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজকার দিনের সামাজিক রূপান্তরের প্রায় প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের উৎস বা মূল কারণ এখানেই অনুসন্ধান করতে হবে। পরিবেশের পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া জনসাধারণের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে, বিশেষত ধন-তন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফলে। সোজা কথায়, সমাজে বিপ্লবী রূপান্তরের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর কারণ কী? কার্ল্ মার্ক্স্ বলছেন :

> যে জাতিরা আগে ভারতবর্ষে এসেছে তাদের মধ্যে শুধু ব্রিটিশেরই সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নততর। ব্রিটিশ ভেঙেছে ভারতীয় গ্রাম্য সমাজের ভিত্তি ও শিল্প বাণিজ্যের উচ্ছেদ করেছে। . ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে রয়েছে এই ধ্বংসের কলংক।.. তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে ভারতের নব জাগরণ শুরু হয়েছে।

বাংলায় এসে প্রতিষ্ঠার পরে এখানকার অর্থনৈতিক রীতি ও সমাজপদ্ধতি ইংরেজ পছন্দ করেনি। অনেক ইংরেজ অবশ্য প্রশংসার জিনিসও দেখেছিল। কিন্তু শাসনভার যাদের ওপরে ছিল তারা ছিল শোষক। তাই দুর্নীতি আর লুণ্ঠনের ফলে এখানকার অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো বদলাতে লাগল। ইংরেজের সুবিধার জন্য সাহায্যকারী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্ট হল যার ফলে সমাজবিন্যাস প্রায় একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। বাণিজ্য ও লুণ্ঠনের সঞ্চিত অর্থ ইংরেজ কাজে লাগাল মূলধন হিসাবে এবং প্রতিষ্ঠিত হল সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র।

বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী প্রাধান্য লাভ করলেও তারা নির্ভর করেছিল ইংরেজের ওপরে। এদিকে ইংরেজের সৃষ্ট জমিদারেরা স্থানীয় দায়িত্ব না নিয়ে শুধু খাজনা দিয়ে উদ্বৃত্ত লাগাল নিজেদের ভোগে। ফলে গ্রাম্য সমাজের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অনিশ্চিত ফসলের ওপরে দ্রুতবর্ধমান লোকসংখ্যার চাপ গুরু থেকে গুরুতর হয়েছে। মহানগরীর আকর্ষণ বিভ্রান্ত করল অনেককেই, অথচ শ্রমশিল্পের সময়োপযোগী প্রসার না হওয়ায় বৃত্তির সুযোগ এল না। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত পূর্বভারতে এই ভাবে ভূমিবিচ্ছিন্ন লোকসংখ্যা বেড়েই চলল। ভূমির উর্বরতার জন্য বাংলার লোকেরা বিহার ও উড়িষ্যার লোকদের মতো মজুর হবার চেষ্টা করেনি; শ্রমবিমুখতাও কিছু ছিল। ফলে শ্রমশিল্পপ্রসারের সংগে বাংলায় মজুরশ্রেণীতে বিহারী ও ওড়িয়ারাই সংখ্যাপ্রধান হয়ে ওঠে। ইংরেজের কল্যাণে কলকাতা হল ভারতের মহানগরী, শুধু বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে নয়, রাজধানী হিসাবেও বটে—নয়া দিল্লি তো অল্প দিনের ব্যাপার। কাজেই কলকাতায় এল ভারতের সব প্রদেশেরই লোক। বাঙালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত তখন মনপ্রাণ দিয়ে নতুন সভ্যতাকে পরিপাক করবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল।

অবাঙালীরা প্রায় বিনা বাধায় প্রতিষ্ঠিত হল অর্থনৈতিক জীবনে। এর ফলে যে সমস্যা পরে দেখা দিল তারই প্রভাবে বাঙালীর সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।

মধ্য যুগে ধীরে ধীরে হিন্দু মুসলমানের যে যৌথ সমাজ গড়ে উঠেছিল ইংরেজী শাসনে সেখানেও ফাটল দেখা দিল। অবশ্য এই ব্যাপার থেকে বোঝা যায় যে সাম্প্রদায়িক সমন্বয় সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু আর্য-অনার্য সমন্বয় হতে কতগুলো শতাব্দী লেগেছিল? আজো তো আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়নি। ইংরেজী আমলের অনেক দিন পর্যন্ত মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিল—১৮৮১ সালের লোকসংখ্যার গণনাতেই প্রথম তাদের সংখ্যা বাড়ে। আবার শিক্ষাদীক্ষায় সমষ্টিগতভাবে হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে সব সময়েই উন্নততর ছিল। কিন্তু বিজিত শাসক সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানেরা আত্মাভিমানে নতুন কৃষ্টি থেকে দূরে সরে রইল। হিন্দুদের কাছ থেকে ইংরেজ নিশ্চয় বেশি সহযোগিতা পেতে চেয়েছিল ও পেয়েছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন শুরু হল: সম্পত্তি চলে যেতে লাগল হিন্দুর হাতে; ইংরেজী শিক্ষা ও নতুন ভাবধারার জোরে হিন্দুরা এগিয়ে চলল; শাসনব্যাপারেও তারা অংশ নিতে লাগল। ব্যাপক ভাবে সামাজিক উন্নতি হল হিন্দুর আর ব্যাপক ভাবে অতি দ্রুত অবনতি ঘটল মুসলমানের। মুসলমান হল কৃপার বস্তু আর হিন্দু হল ঈর্ষার পাত্র। এই ভাবে বিচ্ছেদ ও সামাজিক বিরোধের ভিত্তিতে পরবর্তী কালের সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হল। ইংরেজী আমলের এই আর এক ঘোর সামাজিক বিপ্লব।

কিন্তু এই ব্যাপার থেকে ধারণা করা উচিত হবে না যে হিন্দু মধ্যবিত্তের ওপরে বৃটিশ শাসকের সহানুভূতি বা আস্থা ছিল। তা থাকলে সমস্ত শাসনবিভাগের এবং বিশেষত শোষণবিভাগের উচ্চ পদে হিন্দুর সংখ্যা ১৮৮১ সালেও ইংরেজের তুলনায় এত কম

থাকত না। ১৮২১ সালেও এক. সাহেব লিখেছেন: 'আমাদের ভারতীয় শাসনরীতির মূল সূত্র হবে বিভেদ-ও-শাসন।' একজন বৃটিশ সামরিক কর্তাও এ কথার সমর্থন করেছেন: 'বিভিন্ন *সম্প্রদায় ও জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ না করে বিরোধ সৃষ্টি করাই হবে* আমাদের প্রধান কর্তব্য।'

ইংরেজ-বিদ্বেষ ও সামাজিক গোঁড়ামির মূর্খতার জন্য নতুন ভাবধারা গ্রহণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে বাঙালী মুসলমানের ধীরে ধীরে চেতনা হচ্ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মারফত:

> হোসেন সাহেবের প্রস্তাব সহৃদয় দেশবাসী সকলেই সমর্থন করবেন। আমরা আশা করি যে স্যার্ অ্যাশ্লি ইডেন্ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য এই প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।
>
> — দি বেংগলি : ২১ অগষ্ট্, ১৮৮০

> গভর্ণ্মেণ্ট্ সত্যই যদি মুসলমান সমাজের মংগল কামনা করেন এবং বর্তমানের নিম্নতম স্তর থেকে উদ্ধার করে তাদের উন্নত করতে চান তাহলে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ যাদের আছে তাঁদের এখনই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া উচিত।
>
> — হিন্দু পেট্রিয়ট : ১৬ অগষ্ট্, ১৮৮০

> মুসলমানদের মধ্যে এক সময়ে যে গোঁড়ামি দেখা গিয়েছিল এখন আর তা নেই। এখন বাংলার মুসলমানেরা উচ্চ শিক্ষার জন্য উৎসাহী এবং সর্বক্ষেত্রে তারা শিক্ষিত হিন্দ্ শ্রেণীর সমকক্ষ হতে চায়।
>
> —স্টেট্স্ম্যান্ : ১৫ অগষ্ট্, ১৮৮০

মুসলমান শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ও হিন্দুর লুপ্ত স্বাধীনতা ও গৌরবের স্মৃতি যে এক দল হিন্দুর মধ্যে মুসলিম-বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মুসলমানদের মধ্যেও অনেকের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ঈর্ষা ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মধ্য যুগে অবশ্যম্ভাবী মিলনের পথে দুটি সম্প্রদায়ই এগিয়ে চলছিল।

এমন সময়ে এল বিদেশী তৃতীয় পক্ষ যার শাসনের মূল নীতিই হল ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে রাখা। ১৭৬৫ থেকে ১৮৮৫ পর্যন্ত দেখা যায় ইংরেজ মুসলিম স্বার্থ সম্বন্ধে স্পষ্ট বিরোধিতা না করলেও খানিকটা উদাসীনতা দেখিয়েছে। ১৮৬৫ সালেও লং সাহেব বলছেন যে সংস্কৃতের মতো আরবী ও ফার্সির চর্চার ব্যবস্থা করা ইংরেজের উচিত। লর্ড্ এলেন্‌বরো র 'দৃঢ় বিশ্বাস' ছিল যে ইংরেজের প্রতি মুসলমানের একটা বিদ্বেষ ও শত্রুভাব আছে।

মূল নীতি বজায় রেখে ইংরেজ ভংগী বদলাল তখন যখন নবলব্ধ চৈতন্যের ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করল। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব করবার মতো শক্তি তখন বাঙালী মুসলমানের ছিল না। তবু সাড়া এসেছিল স্বাধীনতার স্বাভাবিক আকাংখায়। ১৯০৫ সালের বংগবিভাগেই ইংরেজের চাল প্রকাশ হল। ইংরেজের মুখপত্র স্টেট্‌স্‌ম্যান্ লিখল যে শিক্ষিত হিন্দুর প্রভাব রোধ করবার জন্য পূর্ববংগে মুসলমানের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা দরকার। এখন থেকেই ইংরেজের চেষ্টা হল যে সংখ্যাগুরুত্ব ও অনুন্নতির অজুহাতে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে দ্রুতগতিতে ইংরেজানুগত মুসলিম মধ্যবিত্ত ও সাম্প্রদায়িক চেতনার সৃষ্টি করা। পরস্পর ঈর্ষার ফলে বিভেদ হয়ে উঠল বিরোধ যদিও স্বাধীনতার অভিলাষ স্বতন্ত্র ভাবে গড়ে উঠতে লাগল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই স্বাতন্ত্র্যের ধারালো সমস্যা ১৯৪৭র ১৫ই অগস্ট্ চিরে দিল বাংলাকে আবার দু ভাগে।

সামাজিক দিক দিয়ে এই বিরোধ ও বিভেদ মধ্যবিত্তের জীবনেই আঘাত হানল বেশি; ফলে দু পক্ষের সামাজিক সম্পর্ক প্রায় অচল হয়ে উঠল। এদের বিষ ছড়িয়ে গেল জনসাধারণের মধ্যে এবং তাদের মধ্যেও জেগে উঠল সাম্প্রদায়িক চেতনা যার চরম রাজনৈতিক পরিণতি ১৯৪৬-৪৭এর দাংগা। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বাঙালী সংস্কৃতির কাঠামো ছিল মূলত 'হিন্দু'। সেটা পরে বিদ্বেষভাবাপন্ন

মুসলিম মধ্যবিত্তের চোখে ভালো লাগেনি ; অতএব শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত চেষ্টা করল ইসলামী সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে, অর্থাৎ কাল-ধর্মকে অস্বীকার করে ফেরবার চেষ্টা হল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর আরবে। কিন্তু অন্য দেশের মুসলমানেরা নিজেদের দেশজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার চেষ্টাই করেছে। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে তাই রক্ত পরিবেশ ঐতিহ্য যৌথসংস্কৃতি ও যুগধর্ম্ম অস্বীকার করে ইসলামী সমাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা আত্মঘাতী হতে বাধ্য।

মধ্য যুগে পোর্তুগীজরা বাংলায় খৃষ্ট ধর্মের হাওয়া আনল। ইংরেজী আমলে কৃশ্চানদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। এর কারণ হল নবলব্ধ শিক্ষার ফলে দেশীয় সব কিছুর প্রতি বিরাগের প্রবৃত্তি, হিন্দুধর্মের অনুদারতা, কৃশ্চান্ মিসনারিদের প্রচারকার্য ও সেবা। কিন্তু ধর্মান্তরীকরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মতো ইংরেজ শাসকদের কোন তীব্র উৎসাহ ছিল না। তা ছাড়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচার, হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা ও সমাজসংস্কারও প্রতিরোধ আনল। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালী কৃশ্চানদের মধ্যে একটা বিষয়ে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সেটি হচ্ছে কৃশ্চানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অভাব।

ইংরেজী যুগের প্রথম থেকেই নব্য বাংলার নেতারা সমাজ-সংস্কারের দিকে মন দিলেন। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রভৃতি বীভৎস প্রথার লোপ, বিবাহ সম্বন্ধে নানা রকম সংস্কার (যেমন বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে অভিযান, বাল্যবিবাহরোধ, অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি) দেখা যায় আধুনিক যুগের বিভিন্ন পর্বে। এই সামাজিক পরিবর্তনের ধারা এখনো চলেছে। জাতিভেদপ্রথায় অনাস্থা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, অবরোধপ্রথার লোপ, কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পাশে নারীর আবির্ভাব, পুরুষ ও নারীর স্বচ্ছন্দ মেলামেশা—এ সমস্তই আধুনিক যুগের দ্রুতপরিবর্তমান মধ্যবিত্ত সমাজের লক্ষণ। অর্থনৈতিক কারণে ধনীদরিদ্রের বিরোধও সামাজিক সম্পর্ক এবং

রীতিকে একাধিক ভাবে পরিবর্তন করছে। এর সংগে নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের সামাজিক পার্থক্যও কমে আসছে।

আধুনিক যুগে বাঙালীর সমগ্র সামাজিক জীবন কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। আর কোনো সময়ে একটি শহর এমন পরিপূর্ণ ভাবে একটি জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণ করেনি। কিন্তু এই কলকাতা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাঙের ছাতা নয়, আবার পরিকল্পনাপ্রসূত একটি সৃষ্টিও নয়। নিরন্তর নিরবচ্ছেদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির তাগিদে এই কলকাতা বেড়ে উঠে হয়েছে আধুনিক বাঙালী জীবনের প্রতীক। তাই একাধিক দিক দিয়ে উনিশ শতকের 'আজব সহর কলকেতা' আধুনিক সমাজের ঐতিহাসিক দিক্‌চিহ্ন। এই দ্রুতপরিবর্তমান সমাজের চিত্র আমরা উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংবাদপত্রে নিপুণ ভাবেই পাই।

'আজব সহব কলকেতা'

উনিশ শতকের কলকাতা ও বাংলা কী ভাবে চলেছিল তার হিসাব মেলে তখনকার সংবাদপত্রে :

> ১৯ দিসেম্বর শুক্রবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর কলিকাতার গৌরীবেড়ে বালিকারদের বিদ্যা পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে অনেক সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিকা সর্ব্ব সুদ্ধা প্রায় দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে।

> হিন্দু কালেজ। ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি বোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় ২৫ জন ছাত্র আছে...বালকেরা ইংরাজি ভাষায় যেমত উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্রূপ ইহার পুর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। যে সাহেব লোকেবা সেখানে ছিলেন তাঁহারা কহেন যে আমরা এই বালকেরদের ইংরাজি শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছি।

...হিন্দু কালেজের একজন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমনকরত ঐ দোকানঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন।

সহমরণ। মোং বাঁশাইনপাড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ ন্যায়বাচস্পতি ·· কোন্নগরের ঘাটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন। এবং তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় বস্ত্র। এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রের আমদানি কিরূপে বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইতেছে তাহা নীচের হিসাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন। ১৮১৫—১৪৯০৬৮ ..১৮২৪—১১৩৮১৬৭।

কলিকাতা বাঙ্ক। ওউল্ড কোর্ট স্ত্রিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীযুত পামর কোম্পানি সাহেবের বাটীতে ২ আগস্ত অবধি কলিকাতা বাঙ্ক নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়াছে।

...উড়ে বেহারারা প্রতিবৎসর কলিকাতা হইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায়।

ভার্য্যাবিক্রয়। জিলা বর্দ্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু.. .... ক এক টাকা পাইয়া ভার্য্যা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল।

তণ্ডুলসম্পাদক নূতন যন্ত্র। অর্থাৎ ধানভানা কল। . তণ্ডুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র সকলে দর্শন করিলেন ঐ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুইজন লোকে ১০ দশ মোন তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে পারে।

কলিকাতার নূতন রাস্থা। মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলা হইতে বহুবাজারে গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্থা হইতেছে।

·· খিদিরপুরের খালের উপর যে নূতন সেতু প্রস্তুত হইবেক...... লৌহময় এবং শৃঙ্খল দ্বারা উদ্বন্ধিত।

...কুলীনেরদের বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণ-

রূপে বর্ণিত হইয়াছে।.... আমরা এস্থলে কএকজন কুলীনের নাম ও তাঁহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি............

ময়াপাড়া— রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— ৬২

জয়রামপুর—নিমাই মুখোপাধ্যায়—৬০

আড়ুয়া—রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—৬০

শ্রীযুক্ত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু। কলিকাতা শহরের সীমা সংযুক্ত পূর্বাংশবাসি— মুখোপাধ্যায় এক সাহেবের হিন্দুস্থানীয় উপপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যাকে বিবাহ করেন ঐ কন্যা সাহেবের ঔরসজাতা......

শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনর্বায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না।

...একাদিক্রমে জবনরাজ্যের চিহ্নসকল এতদ্দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

কাঁচড়াপাড়ার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনায় তখনকার দিনের সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক বিবরণ পাওয়া যায় :

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে।

আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রতধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।

নীলকরের হুদ্দ নীলে, নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্বনাশ।

যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
... ...
যখন আসবে শমন, কোরবে দমন,
কি বলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি 'হুট' বলে 'বুট' পায়ে দিয়ে,
'চুরুট' ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

উনিশ শতকের বাঙালী সমাজজীবনের নিপুণ চিত্র মেলে দুটি বইতে—'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬১)। একটি উপন্যাস, অপরটি সমাজ-চিত্র; একটির লেখক 'ঠেকচাঁদ ঠাকুর' বা প্যারিচাঁদ মিত্র, অপরটির লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ। দুজনেই কলকাতার লোক, আর তাই বিশেষত কলকাতার জীবনযাত্রা তাঁদের লেখায় নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার এক জনও ইংরাজী ভাষা জানিত না।...ফ্রেন্‌কো ও আরাতুন পিট্রস প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাহেব কিছু কাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা পড়িত।...

· বৈদ্যবাটির বাবুরাম বাবু বাবু হইয়া বসিয়াছেন। হরে পা টিপিতেছে। এক পাশে দুই একজন ভট্টাচার্য্য বসিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক করিতেছেন—আজ লাউ খেতে আছে—কাল বেগুন খেতে নাই... এক পাশে কয়েকজন শতরঞ্চ খেলিতেছে।...দুই একজন গায়ক যন্ত্র

মিলাইতেছে…মুহুরিরা বসিয়া খাতা লিখিতেছে—সম্মুখে কর্জদার প্রজা ও মহাজন সকলে দাঁড়াইয়া আছে…

…নৌকা দেখিতে দেখিতে ভাঁটার জোরে বাগবাজারের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাস ২ করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হু ২ করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে।…

…জাব চারনক একজন সতীকে চিতার নিকট হইতে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন…জাব চারনক বটুকখানা অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিতেন, তথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ ছিল তাহার তলায় বসিয়া মধ্যে ২ আরাম করিতেন ও তমাক্ খাইতেন…ঐ গাছের ছায়াতে তাঁহার এমনি মায়া হইল যে সেই স্থানে কুঠি করিতে স্থির করিলেন। সূতানুটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম একেবারে খরিদ হইয়া আবাদ হইতে আরম্ভ হইল; পরে বাণিজ্য নিমিত্ত নানা-জাতীয় লোক আসিয়া বসতি করিল ..লোকে বলে ইংরাজের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে তাঁহার (ব্লাকিয়র্ সাহেবের) জন্ম হয়।

নীলকর সাহেব দাঙ্গা করিয়া কুঠিতে যাইয়া বিলাতি পানি ফটাস্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিয়া খাইয়া শিশ দিতে দিতে 'তাজা বতাজা' গান করিতে লাগিলেন—কুকুরটা সম্মুখে দৌড়ে ২ খেলা করিতেছে। তিনি মনে জানেন তাঁহাকে কাবু করা বড় কঠিন…

—'আলালের ঘরের দুলাল'

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস, তাই গল্পের ধারাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা, আগাগোড়াই সমাজচিত্র :

কলকেতা সহরের চারদিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠ সড়্সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি

প্রস্তুত কচ্চে : সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবান গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজোন।"...........আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা ছুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল 'উঁচু কেতা সহরের গোবরের বষ্ট,' দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ।'...

..সকালবেলা সহরের বড়মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকিলের বাড়ীর হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আচেন।...কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উট্‌নোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন।...কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন...পেণ্টুলুন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কালো রঙ্গের চোঙ্গা টুপি। আদালতী সুরে হাতমুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন।

...কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক ...সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে...

..পূর্ব্বে চুঁচড়োর মতো বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতোনা, 'আচাভো' 'বোম্বাচাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানাস্থানের বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখতে যেতেন...

..এখন আর সে কাল নেই...গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের চূন দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না...

নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো।..পুঁটে

তেলি রাজা হলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগলো।...হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে।......পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।...

...পূর্বের বড়মানুষরা এখনকার বড়মানুষদের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েসন, এড্রেস্, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না। বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল...তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগতো...সেই সময় বিষয়কর্ম দেখা, কাগজপত্রে সইমোহর চলতো......রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো। .....

...সহরের অনেক বড়মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন। বাবু চুণোগলির অ্যানড্রুর পিদ্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসি হন...

...মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালিরা ফাঁসি ছেঁড়া আসামীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন ..

.. কলকেতার ব্রাহ্মণভোজন দেখতে বেশ - হুজুররা আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়ীতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে ফলারের দিন সেগুলি সব বেরোবে...

...কলকেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন...বিস্তর ভট্চার্যিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তারপর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেকে গোবর খান ..যতদিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব ততদিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই।

—'হুতোম প্যাঁচার নকশা'

৪ : নীতির সন্ধানে

বাংলার অর্থনীতি কৃষিপ্রধান ; তাই গ্রাম্য জীবনের প্রাধান্যই বাঙালীর আর্থিক অবস্থাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। এই অর্থনৈতিক অবস্থার সংগে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বাংলার নদীর। কৃষিকার্য অন্তর্বাণিজ্য ও যাতায়াতের জন্য এই নদীগুলি তাদের শাখা ও খাল প্রভৃতির প্রয়োজন হয় ; আর সেই জন্য বাঙালীর অর্থনীতি অনেকটা নির্ভর করে তার নদীর মেজাজের ওপরে। অবশ্য পশ্চিম বংগে খনিজ সম্পদের বেলায় এ কথা খাটে না, কিন্তু এখানকার কৃষি ও স্বাস্থ্য নিঃস্ব হতে চলেছে নদীরই অভিশাপে। মুসলমানী আমলে বিজ্ঞানসম্মত খাঁটি শ্রমশিল্প এখানে বা ভারতে ছিল না। তার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাচীন কাঠামো এখনো পরিত্যাগ করতে পারেনি। অবশ্য শ্রমশিল্প যে একেবারেই ছিল না এ ধারণা মোটেই সত্য নয়। বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পের প্রয়োগে পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে আধুনিক যুগে ইংরেজের নেতৃত্বে। যুগে যুগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে নদীর বিপ্লবে আর বৈদেশিক আক্রমণে - পাঠান মোগল ফিরিংগি মগ ও বর্গির অভিযানে। অবশেষে ইংরেজের সুপরিকল্পিত নির্মম শোষণ।

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগে বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। ধানই ছিল প্রধান শস্য আর কৃষিপ্রণালীও ছিল মোটামুটি এখনকার মতোই। চাষীদের সংগে রাজা বা সামন্ত রাজাদের ঠিক কী রকম সম্পর্ক ছিল বলা কঠিন ; তবে বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক দায়িত্ব

নিশ্চয় ছিল সামন্তদে[illegible]পরে এবং পঞ্চায়েতী পদ্ধতির সংগেও এর সম্পর্ক ছিল। ধান ছাড়াও তুলো সরষে আখ ও নানা রকম ফলের চাষ ছিল, আর মাছ তো নদীতে ছিলই। ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আরো কয়েকটি ব্যাপারে নিষ্কর ভূমি দেবার ব্যবস্থা করা হত।

শিল্প প্রধানত 'কুটিরজাত' শ্রেণীরই ছিল। বৃহৎ শ্রমশিল্পের সম্ভাবনা থাকতেই পারে না। বাঙালীর বস্ত্রশিল্প শুধু মধ্য যুগে নয় প্রাচীন যুগেও ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধ ছিল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে আমরা জানতে পারি যে বাঙালী অতি প্রাচীন কাল থেকেই রেশমের চাষ ও বয়ন ভালো করেই জানত। ধাতু ও প্রস্তর শিল্পের উন্নতির প্রমাণ বহু পাওয়া যায়। জলপথের আধিক্য থাকায় বাঙালীকে নৌশিল্প গড়ে তুলতে হয়েছিল। বাঙালী নৌবাহিনীর কথা কালিদাসও উল্লেখ করেছেন। খালিমপুর তাম্র-শাসনে ধর্মপালের নৌবাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। নানারকম সওদা-গরি নৌকার উল্লেখও পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙালী কারুকারেরা গোষ্ঠী বা সংঘ গঠন করত নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও শিল্পোৎকর্ষের জন্য ; এই বিভিন্ন শিল্পিসংঘগুলিই বৃত্তি-সম্প্রদায় থেকে পরে নানা জাতিতে পরিণত হয়।

বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেছিল বাংলার নদী ও সমুদ্রতীর। নদী ও সমুদ্রের ধারে ধারে তাই অনেক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম হাট গঞ্জ ও শহর গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে এক গ্রীক নাবিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে গংগার মোহনায় গংগে নামে এক বন্দর ছিল। এখান থেকে দক্ষিণ ভারত সিংহল বা দূর প্রাচ্যের মালয় জাভা ইত্যাদি দেশে বাঙালীর বাণিজ্য চলত। পরে তাম্রলিপ্তি তাম্রলিপ্ত বা তমলুকই প্রধান বন্দর হয়ে উঠে। স্থলপথে ব্রহ্ম আসাম চীন নেপাল ভুটান ও তিব্বতের সংগে বাণিজ্য ছিল। বাঙালীর অর্থ-নৈতিক ঘনিষ্ঠতা এই ভাবে প্রাচ্যের অনেক দেশেই স্থাপিত হয়

এবং বাণিজ্যের সংগে বাঙালী সংস্কৃতিও নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তার নিদর্শন আজো মেলে। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা হিয়ন্ তাম্রলিপ্তের অর্থ ও সমৃদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে ই চিঙের আগমনের সময়ে সমুদ্রের মোহনার অবনতির জন্য তাম্রলিপ্ত সরে গিয়েছিল জলরেখা থেকে, আর তার পরেই সেই বিরাট বন্দরের অধোগতি শুরু হয়।

মধ্য যুগ

পাঠানদের আগমনে বাংলার নাগরিক ও গ্রাম্য অর্থনীতি খানিকটা বিশৃংখল হয়ে পড়ে। তার কারণ এ যুগের যুদ্ধবিগ্রহ লুণ্ঠন ও অরাজকতা। কিন্তু অনেকটা অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাঙালী তার গ্রাম্য সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো মোটামুটি বজায় রেখে অনেক বিষয়ে উন্নতিও করেছিল। এর কারণ এই যে পাঠানেরা বেশির ভাগ সময়েই যুদ্ধে ব্যস্ত থেকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করে নি। অর্থনৈতিক দায়িত্ব মোটামুটি হিন্দু বাসিন্দাদেব হাতেই ছিল। অর্থনৈতিক ধারা পুরানো খাতেই চলত। গণতান্ত্রিক ইসলাম কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে কোনো রকম উন্নতি করেনি। আমীর-ওমরাহ্ বা উচ্চ বর্ণের লোকেরা সুখে ও বিলাসিতায় জীবন যাপন করতেন কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দু বা ধর্মান্তরিত মুসলিম জনসাধারণ বিশেষ কষ্টে না থাকলেও দরিদ্রই ছিল। বৈদেশিক লেখকেরা দেশের সর্বত্র আর্থিক ব্যাপারে এই শোচনীয় শ্রেণীবৈষম্য দেখেছেন।

মোগল যুগে কেন্দ্রীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রবল হওয়ার ফলে রাজস্বের বেশির ভাগই চলে যেত দিল্লিতে ; এ ব্যাপার কিন্তু পাঠান আমলে ঘটেনি। মুর্শিদ কুলি খাঁ তো মোগল আমলের শেষ দিকে কোষাগারে ধনরত্নের স্তূপ গড়ে তুলেছিলেন। ইংরেজরা বাংলা দখল করে লুঠতরাজ ও ঘুসের ভেতর দিয়ে যে কল্পনাতীত শোষণ করেছিল

তার সম্ভাবনা হল কী করে ? এত সম্পদ এল কোথা থেকে ? জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েই এ অর্থস্তূপ রাজকোষে ও ধনীগৃহে তুলে দিয়েছিল।

দেশে অবশ্য কঠোর দারিদ্র্য ছিল না। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান যে খুব উচ্চ ছিল না তা বৈদেশিক লেখকদের কথা থেকেই বোঝা যায়। নগরে ও গ্রামে জনসাধারণের গৃহ ও গৃহসজ্জা দৈন্যই নির্দেশ করত। নগরগুলি নদীতীরেই অবস্থিত থাকায় তাদের দৈর্ঘ্য ছিল বেশি ; কয়েকটি পথ ছাড়া বাকিগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল। বাঁশ কাঠ মাটি দিয়েই ঘর তৈরি হত। ইট পাথরের বাড়ী নগরেও বেশি ছিল না। ঘরের দরজা জানলা সাধারণত ছোটই ছিল। উঁচু প্রাচীর তুলে বাড়ী ঘেরা থাকত। এই সব কারণে মহামারীর সময়ে নগরের স্বাস্থ্য বিপন্ন হত। মহামারীতে গৌড় একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধূলো দূর করবার জন্য ভিস্তি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রাজপথের দু ধারে গাছ ও সরাইখানা থাকত, এখানেই পথিকদের আস্তানা ছিল।

ধুতি উড়ানি ও শাড়ীই সাধারণে ব্যবহার করত। বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি থাকলেও জনসাধারণের বসনস্বল্পতা বৈদেশিকেরা লক্ষ্য করেছিলেন। নানা রকম ছাতার ব্যবহার ছিল - তাল পাতা, গুয়া পাতা ও বেতের শিক দেওয়া কাপড়ের। শেষোক্ত বড় বড় ছাতা সংকীর্তন ও শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত হত।

পাঠান অধিকারে সামান্য আদায়কারীরা বংশানুক্রমে কাজ করার পর অনেক সময়ে প্রবল জমিদার হয়ে উঠত। পাঠান ও মোগল আমলে এ রকম শক্তিশালী জমিদারের সংখ্যা অনেক ছিল। জমিদারির উচ্ছেদ আইনসংগত হলেও এ রকম উচ্ছেদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, নিলামের ব্যবস্থাও নয়। এই সব কারণে জমিদারেরা ক্রমে স্বত্ববিশিষ্ট ভূস্বামী হয়ে ওঠে। হিন্দুরাজত্বে ভূমিতে প্রজার স্বত্ব ছিল, কিন্তু মুসলমান আমলে প্রজাস্বত্ব ক্রমেই সংকুচিত হয়ে

আসছিল আর সংগে সংগে উদ্ভব হচ্ছিল মধ্যস্বত্ব-অধিকারী শ্রেণীর।

বৈদেশিক বিবরণ থেকে আর্থিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অনেক কথা জানতে পারা যায়। ইতালীয় ও পোর্তুগীজ পর্যটকরা বাংগেলা শহরের সমৃদ্ধির কথায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। এ শহর ছিল বিরাট ব্যবসাকেন্দ্র। বস্ত্র আখ চিনি আদা ইত্যাদি বহু দ্রব্যের ব্যবসা হত; সাতগাঁ বন্দরে বছরে ৩০।৩৫ খানি জাহাজে চাল কাপড় তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের চালানের বন্দোবস্ত ছিল। রল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ বাংলার অনেক শহরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে চাল ও কাপড় উৎপন্ন হত। ইনি শ্রীপুর ও সোনার গাঁ শহরের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন; এঁর মতে সোনার গাঁ অঞ্চলেই ভারতের উৎকৃষ্টতম বস্ত্রশিল্প ছিল।

কিন্তু এত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও জনসাধারণের হাতে টাকা শুধু অল্প ছিল না, তার ব্যবহারের সামর্থ্য ও সুযোগও অল্প ছিল। শ্রমজীবীদের অবস্থা ভালো না হলেও কৃষক ও কারুশিল্পী মোটামুটি অভাবগ্রস্ত ছিল না। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় তাই বাংলার নাম ছিল 'জিন্নেৎ উল্‌ বেলাৎ' (মর্ত্যের স্বর্গ)। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন এখানে ছিল। সৈন্যদলে ও অর্থবান লোকদের অধীনে বহু দাস থাকত। ফিরিংগিরা ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা অনেক সময়ে মধ্য প্রাচ্যে এ দেশের লোককে বিক্রয় করে আসত। বিহারে 'নফর' বেশি মিলত, কিন্তু বাংলাতেও অভাব ছিল না। ক্রীতদাসদের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিল্পপ্রভাব বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায় না; বাংলাই দিল্লি সাম্রাজ্যের খাদ্য ও বস্ত্রের উৎস ছিল। অজন্মা হলে অবশ্য শস্য পাঠানো কিছু বন্ধ করে সময়োচিত ব্যবস্থায় দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা হত।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবনে আবির্ভাব হল বিদেশী বণিকদের। ফিরিংগি বা পোর্তুগীজ বণিকেরা এই সময়ে

প্রাচ্যের মশলাবাণিজ্য দখল করে বসেছিল। সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে তাদের পত্তন শুরু হবার পরেই বংগোপসাগর ও বাংলার নদীপথে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়ল। ক্রমে হুগলি হিজলি তমলুক ঢাকা শ্রীপুর বাকলা প্রভৃতি জায়গায় ফিরিংগিদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচ্য বাণিজ্যের ওপর এদের এমন অধিকার হয় যে এদের ছাড়পত্র ছাড়া ভারতীয়েরাও জলপথে বাণিজ্য করতে পারতেন না। বারভুঁইয়াদের পরস্পর দ্বেষ ও মোগলবিরোধী পাঠান-নীতি এদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু এদের বাণিজ্যাধিকার বেশি দিন টেকেনি শুধু অত্যাচারের জন্য। এদের কাছ থেকে কিছু কিছু সুবিধা অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এ কথা ঠিক যে এদের জন্য বাঙালীর অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর, এবং এদেরই উৎপাতে বাঙালীর বহির্বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়।

পোর্তুগীজদের পরে মধ্য যুগের বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাসে ইংরেজ-ওলন্দাজ-ফরাসীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি বেশি দিন স্থায়ী না হলেও ইংরেজ-ফরাসীর সংঘর্ষ বাণিজ্য থেকে আরম্ভ করে সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়। হুগলি ও কলকাতায় বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের পর অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে ইংরেজদের প্রভুত্ব আরম্ভ হল; চন্দননগরের ফরাসী ঘাঁটি বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারল না। মোগল যুগের শেষ দিকে যে দুর্নীতির স্রোত বয়েছিল তারই সুযোগে ইংরেজরা উচ্চপদস্থ কর্ম-চারীদের ঘুষ দিয়ে ও নানা প্রকার অসৎ উপায়ে বাণিজ্যশুল্কের এমন সুবিধা করে নিয়েছিল যে দেশী-বিদেশী কোনো বণিক আর তাদের সংগে পেরে ওঠেনি। এই ভাবে শোষণের ইতিহাস এগিয়ে চলে এবং বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য ইংরেজদের হাতে চলে যায়। বাংলা থেকে ইংরেজ প্রতিনিধি ১৬৯৮ সালে লিখে পাঠিয়েছিলেন: 'ফার্মান্ দানপত্র ও সন্ধিসূত্রে কোম্পানী ভারতের প্রায় সর্বত্র অতিরিক্ত বাণিজ্য

সুযোগ পেয়েছেন এবং শুল্ক থেকে একেবারে রেহাই পেয়েছেন ; অন্য ইউরোপীয় বণিক এমন কি দেশীয় বণিকও এত সুবিধা পায়নি।' সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এই ভাবে মোগল শাসনকর্তারা স্বার্থ ও মূর্খতার জন্য বাংলার তথা ভারতের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বনাশের গোড়াপত্তন করেন।

বাংলায় ইংরেজের আগমনের (১৬৫১) সময়ে বৃহৎ বংগ ছিল ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সপ্তগ্রাম নষ্ট হলেও হুগলি ও কাশিমবাজার তখন বিখ্যাত বন্দর। চাল গম চিনি তেল ঘি মসলিন রেশম প্রভৃতি দ্রব্য স্থলপথে ও বিশেষত জলপথে তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নানা দেশে রপ্তানি হত। প্রায় এক শো জাহাজ প্রত্যেক বছর বাংলার বিভিন্ন বন্দর থেকে বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। হিন্দু বণিকদের ওপরে প্রভেদাত্মক কর প্রচলিত ছিল; আর অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় ইংরেজরা সহজেই দেশীয় হিন্দু বণিকদের উচ্ছেদ করতে সুবিধা পেল। এ ছাড়া বাণিজ্য জাহাজের ওপরে লুটতরাজ তো ছিলই। বাণিজ্যের অধোগতির সংগে বহু শিল্পের লোপ ও অর্থ নৈতিক বিপ্লব শুরু হয়।

আধুনিক যুগ

১৭৬৫ সালে ইংরেজ বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপন করল। শোষণ এবার শুধু বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে নয় ; বণিকের ছদ্মবেশ ছেড়ে সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ কোম্পানীর আয়বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত লাভের জন্য অত্যাচার লুণ্ঠন ও উৎকোচের শোষণে বাংলাকে রিক্ত করে ফাঁপিয়ে তুলল নিজের মূলধন। ইংল্যাণ্ডের আকস্মিক প্রগতি খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় ১৭৬০ থেকে ১৮১৫র মধ্যে। এই মূলধনই যুগিয়েছে বাংলা ও ভারত আর এর জোরেই ইংরেজ সারা পৃথিবীতে করেছে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্তার।

ইংরেজী শাসনে পুরানো বণিক মধ্যবিত্ত ও শিল্পীশ্রেণী নষ্ট হয়ে যায় ; তাদের জায়গায় আসে এক চাকুরে পেশাদার শ্রেণী। বস্ত্রশিল্পের স্বাধীন সদাগর হল চুক্তিকারক দালাল, পরে গোমস্তা ও যাচনদার। দৈহিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারে তাঁতীরা তাঁত ছাড়ল, আর আঠারো শতকের প্রথমেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের ওপরে সারা য়ুরোপে শুল্ক চাপল, নষ্ট হল রপ্তানি। ১৮৩৪ সালে এই ভাবে এক কোটি টাকার বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেল। বিলেতী কাপড়ের আবির্ভাবে দেশী তাঁতীদের বিপর্যয় আরম্ভ হল। এ ভাবে দিনে দিনে শিল্পনাশের ফলে জনসাধারণ অতিরিক্ত চাপ দিতে লাগল চাষের ওপর ; ফলে শিল্পমৃত্যুর যুগে কৃষিরও অপমৃত্যু ঘটবার লক্ষণ ঘনিয়ে আসতে লাগল।

খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য লর্ড কর্ণ্ওয়ালিস্ ভূমি-সংক্রান্ত কায়েমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করলেন। ফলে চাষীর ঘাড়ে জমিদার ছাড়াও নানা স্তরের মধ্যবর্তী শোষক শ্রেণীর ভূত চাপল—পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, চুকনিদার ইত্যাদি। এ ছাড়াও জোতস্বত্ব ভোগ করার জন্য এক দল লোকের আবির্ভাব হল। ভূমিস্বত্বের ভাগাভাগি ও কৃষির পোষ্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে গ্রাম্য অর্থনীতির সংকট ঘনিয়ে এল। ভূমির শোষকের সংখ্যা বেড়েছে, কমেছে পোষকের। জোতস্বত্ব গ্রাস করেছে মহাজন, আর ভূমিহীন কৃষাপবৃদ্ধিতে ও চাষীর ঋণে কৃষি-অর্থনীতি তথা কৃষি-প্রধান দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

বাংলার প্রভু হয়ে ক্লাইভ্ বললেন : 'সমস্ত খরচ বাদ দিয়েও কোম্পানির লাভ হবে ১৬,৫০,৯০০ পাউণ্ড্।' কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরে' মন্বন্তরের পর হেষ্টিংস্ লিখলেন হিসাব কষে : 'যদিও এ প্রদেশের তিন ভাগের একভাগ লোক মরেছে এবং চাষের চরম অবনতি হয়েছে তা হলেও ১৭৭০ সালের আদায় ১৭৬৮রও বেশি। এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে শুধু কড়া চাপে।' কী কড়া চাপ দুর্ভিক্ষপীড়িত

বাঙালীর ওপরে পড়েছিল তা কল্পনা করাও কঠিন। অথচ রাজস্বের শতকরা এক ভাগও দেশের জন্য খরচ করা হয়নি।

শোষণসঞ্চিত মূলধন থেকে গজিয়ে উঠল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক দরদী ইংরাজের সাহায্য বাঙালী পেয়েছে। কিন্তু যন্ত্র-ও-বিজ্ঞান যুগের যে অগ্রগতি তা হয়েছে অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক কারণে। নিজেদের অজ্ঞাতসারে এবং পরে অনিচ্ছায় ইংরেজরা এ দেশকে আধুনিক প্রগতির পথে ঠেলে দিয়েছে। যন্ত্রদানবের আবির্ভাবে শ্রমশিল্পযুগেরও আবির্ভাব হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন যে কী বিরাট তা বুঝতে পারি তখন যখন ভাবি যে এর ফলে সমগ্র প্রাচীন ও মধ্য যুগের দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারা থেকে বাংলা ও ভারত একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কূপমণ্ডুকতা দূর হল রেলপথ জাহাজ আর আকাশযানে; হাজার হাজার যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতে ও শ্রমশিল্পে, সোজা কথায়, একটা অভাবনীয় জীবনবিপ্লব এসে গেছে।

> বৃটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতবর্ষে যে নতুন সমাজব্যবস্থার বীজ বপন করতে বাধ্য হবে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন ইংলণ্ডের মজুরশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি দখল করবে, অথবা যখন ভারতীয় জনসাধারণ সংগ্রাম করে বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তি পাবে।
>
> —কার্ল্ মার্ক্স্

হাণ্টার্ বলেছেন যে সারা ভারত বাংলা থেকে অর্থ শোষণ করেছে। মোগল যুগের অর্থনীতি ও পরে ব্রিটিশ শাসন এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু যন্ত্রযুগের আবির্ভাব ও মহানগরীর সৃষ্টি বাংলাতেই প্রথম হয়েছে আর তাই বাংলা দেশই ভারতের নবযুগ-চেতনার জন্মভূমি :

> আমরা হিন্দুদের মতো মন্দির বা মুসলমানদের মতো প্রাসাদ

মস্‌জিদ্‌ ও কবর নির্মাণের দিকে তাকাইনি।......আমরা এসেছি আধুনিক নগর নির্মাণের জন্য।.. ভারতে নতুন শ্রমশিল্প যুগের সূচনা হয়েছে।

—হাণ্টার্

তাই হিন্দুদের গৌড় আর মুসলমান যুগের ঢাকা মুর্শিদাবাদ থেকে আধুনিক কলকাতা অনেক দূরের পথ। 'চৈতন্য ভাগবত' লিখছেন :

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই। ..
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে,
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।

কিন্তু হুতোম প্যাঁচার 'আজব সহর কলকেতা' বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবী যুগান্তরের অগ্রদূত। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে ইংরেজী আমলে অর্থনৈতিক স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হয়েছে। দারিদ্র্য বন্যা ও দুর্ভিক্ষ তো ইংরেজী শাসনের খাঁটি পরিচয় দেবে। অ্যামেরির মত মেনে নিয়ে পঞ্চাশের মর্মান্তিক মন্বন্তরকে কি 'দৈব ঘটনা' বলে শান্ত হওয়া চলে? ইংরেজের অর্থনৈতিক অবদান হল পুরানো ইমারতের ধ্বংসের ওপরে নতুন যুগের ভিত্তিস্থাপন।

প্রথম মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক আঘাত বাংলাকে বিপর্যস্ত করল। কিন্তু নতুন যুগের গতি ব্যাহত হয়নি। নতুন নতুন শ্রমশিল্প গড়ে উঠতে লাগল। চাষীদের জীবনে বিপদ ঘনিয়ে এল, শুরু হল মধ্যবিত্তের সংকট। বাংলায় অবাঙালীর অর্থনৈতিক আধিপত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ ব্যাপার অবশ্য নতুন নয়; মুসলমানী আমল ও বিশেষত মোগল যুগ থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়েছিল। ইংরেজের পূর্বভারত নীতি ও পরে ভারতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের অখণ্ডতার জন্য অবাঙালী ব্যবসায়ী ও মজুর স্রোতের মত এসেছিল মহানগরে ও বাংলার শ্রমশিল্পকেন্দ্রের আসে পাশে। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর

বাঙালীর ব্যবসাদারি খানিকটা এগিয়ে চলেছিল মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকটের তাগিদে। কেরানীগিরি ওকালতি ডাক্তারি আর শিক্ষকতায় অন্নসংস্থান হওয়া কঠিন হল। ধীরে ধীরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল—বাঙালী ও অবাঙালীর, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নবচেতনাও ক্রমশ প্রকাশ পেল চাষী-মজুরের আন্দোলনে। রাজনীতি ও সমাজের মূলে যে অর্থনীতির প্রভাব থাকে উনিশ শতকের সংস্কৃতির জোয়ারে এ কথা লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। অন্নবস্ত্রে টান পড়তেই অর্থনৈতিক চেতনার ফলে বাঙালীর মানসক্ষেত্রে ও কর্মজীবনে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিল।

বৃটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী দীর্ঘ ইতিহাস। ইংরেজী আমলের আগে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিচের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় :

> .. ...ক্ষুদ্রতম গ্রামেও চাল ময়দা মাখন দুধ শাকসবজি চিনি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
>
> —ট্যাভার্নিয়ার্

> ..... মোগল রাজ্যগুলির মধ্যে বাংলাই ফরাসী দেশে সব চেয়ে বেশি পরিচিত।..... সব জিনিসই এখানে প্রচুর—ফল ডাল রেশমী ও সূতী কাপড় ইত্যাদি।
>
> —মানুচি

> .... বাংলা মিশরের চেয়েও অনেক বেশি ধনী।.. ...রাজমহল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত অসংখ্য খাল গংগা হতে প্রাচীনকাল থেকেই কাটা হয়েছে জলসেচ ও জলপথের জন্য।
>
> —বার্নিয়ার্

> . ..এই শহর (মুর্শিদাবাদ) লণ্ডনের মতোই বৃহৎ জনবহুল ও ধনসম্পন্ন। প্রভেদ এই যে মুর্শিদাবাদের ধনী ব্যক্তিরা লণ্ডনের বড় লোকদের চেয়ে অনেক বেশি অর্থশালী।
>
> —ক্লাইভ্

অবশ্য এ সব বর্ণনায় খানিকটা অতিরঞ্জন ও উচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু

তা হলেও বোঝা যায় যে বাংলার অপরিমেয় সম্পদের লুণ্ঠনই রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে বিরাট শ্রমশিল্পযুগের আবির্ভাবের মূলে।

ইংরেজী আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থায় তিনটি পর্যায় দেখা যায় : (১) প্রত্যক্ষ ভাবে লুণ্ঠন ; (২) বিদেশী বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস ; (৩) বিদেশী মূলধনের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে পরোক্ষ ভাবে শোষণ। প্রথমটির ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি এল উনিশ শতকে এবং তৃতীয়টি উনিশ শতকের শেষ থেকে চলেছে বর্তমান সময় পর্যন্ত। প্রথম পর্যায়টি বাংলায় খুব স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় ; শেষের দুটি আরো জটিল কারণ উনিশ ও বিশ শতকে বাংলার অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতি থেকে পৃথক ভাবে দেখা কঠিন। প্রথমটির বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য হচ্ছে এই যে বাংলা-লুণ্ঠনই প্রধানত ইংরেজের বিরাট শ্রমশিল্পযুগের সৃষ্টি সম্ভব করেছে আর তার ফলে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

মোগল আমল থেকেই নানা রকম অসদুপায়ে ব্যবসার ছদ্মবেশে ইংরেজের লুণ্ঠন আরম্ভ হয়েছিল ; দেওয়ানি পাবার পরে তার বৃদ্ধি হল। ১৭৬২ সালে বাংলার নবাব অভিযোগ করলেন :

> আসল দামের এক-চতুর্থাংশ দিয়ে এরা দেশীয় চাষী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে মাল আদায় করে এবং এক টাকা দামের জিনিস পাঁচ টাকায় চাপিয়ে দিয়ে যায়।

১৭৭৩ সালে পার্লামেণ্টে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিবরণীতে দেখা যায় যে দেওয়ানির প্রথম ছয় বছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১,৩০,৬৬,৭৬১ পাউণ্ড। তা ছাড়া কর্মচারীরা লুণ্ঠন ও উৎকোচের দ্বারা কল্পনাতীত সম্পদ সংগ্রহ করে। আড়াই লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে ক্লাইভ্ ঘরে ফেরেন ; তা ছাড়া তাঁর জমিদারির বাৎসরিক আয় ছিল সাতাশ হাজার পাউণ্ড। ইংরেজের লোভ ও লুণ্ঠনে

বাঙালীর কী দুর্দশা হয়েছিল তা বর্ণনা করা যায় না। ১৭৬৪ সালে নবাবী আমলে খাজনা ছিল ৮,১৭,০০০ পাউণ্ড; ১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিসের কায়েমি বন্দোবস্তে খাজনা হল ৩৪,০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ চার গুণেরও বেশি।

> এই সুন্দর দেশ···ইংরাজী শাসনে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। .. এই ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ দেশব্যাপী শিল্পের ওপর কোম্পানির একাধিপত্য।
>
> —মুর্শিদাবাদের ইংরেজ কর্মচারী বেচার (১৭৬৯)

> আমাদের কুশাসনের এমনি দুর্বার উৎসাহ যে কুড়ি বছরের মধ্যেই দেশের অনেক স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।
>
> —পার্লামেণ্টের সদস্য ফুলার্টন্ (১৭৮৭)

> আজ যদি আমাদের ভারত ছাড়তে হয় তা হলে ওরাংউটাং বা বাঘের চেয়ে কোনো ভালো জানোয়ারের অধিকারে যে এ দেশ ছিল তা প্রমাণ করবার কিছুই থাকবে না।
>
> —বার্ক্

অথচ ১৮৫৮ সালেও সদাশয় মহামতি জন্ স্টুয়ার্ট্ মিল্ কোম্পানির 'পবিত্রতম উদ্দেশ্য' ও মানবিকতার মহত্তম কার্যের গুণকীর্তন করেছেন। এই ওকালতির উদ্দেশ্য ছিল এই যে কোম্পানির হাত থেকে শাসনভার যেন সিপাহি বিদ্রোহের পরেও চলে না যায়।

ব্রুক্স্ অ্যাডাম্স্ লিখছেন ঃ

> পলাশী যুদ্ধের পরেই বাংলা-লুণ্ঠনের অর্থ লণ্ডনে আসতে শুরু করল এবং অবিলম্বেই ফল বোঝা গেল।... ১৭৬০র আগে ল্যাংকাশিয়ারে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতি ভারতের মতোই সহজ সরল ছিল; আর ১৭১০ সালে ইংল্যাণ্ডে লৌহশিল্পের অবস্থা তো অতি শোচনীয় .. ১৭৫৭ য় পলাশী যুদ্ধ হল আর তার পরে দ্রুত পরিবর্তনের বোধ হয় কোনো তুলনাই মেলে না।

তার পরেই 'ব্যাংক্ অফ্ ইংল্যাণ্ড্' ১৭৫৯ থেকে মূলধনে ফেঁপে উঠল। ১৭৬০ থেকে ১৭৬৮র মধ্যে উৎসাহ ও তাগিদের ফলে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল যার ফলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এক অভাবনীয় শ্রমশিল্পযুগের আবির্ভাব ঘটল।

১৮১৩ থেকে আরম্ভ হল দ্বিতীয় পর্যায়। ১৮১৪ আর ১৮৩৫র মধ্যে ইংল্যাণ্ড্ থেকে ভারতে কাপড়ের রপ্তানি বাড়ল ১০ লক্ষ গজ থেকে ৫১ কোটি গজের ওপরে। ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানি কমে গেল তিরিশ বছরে (১৮১৪-১৮৪৪) সাড়ে বারো লক্ষ থেকে তেষট্টি হাজারে। বিদেশী শ্রমশিল্পের যান্ত্রিক আঘাতে বাংলার তাঁতীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। এই ভাবে একটির পর একটি শ্রমশিল্প নষ্ট হয়ে যেতে লাগল আর অতিরিক্ত চাপ পড়ল চাষের ওপর। কারুকারেরা শ্রমশিল্প থেকে বিতাড়িত হয়ে হল চাষী মজুর ভিক্ষুক। দারিদ্র্য ও অন্নাভাবে দেশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। শুধু উনিশ শতকের শেষার্ধেই সারা ভারতে ইংরেজের সুশাসনে ২৪টি দুর্ভিক্ষে ২ কোটির ওপর লোক মারা গেল। অতিরিক্ত জনসংখ্যাবৃদ্ধি হয়নি, বৃদ্ধির হার ইংল্যাণ্ডের চেয়ে অনেক কম ছিল। দুর্গতির কারণ পুরানো দেশী শ্রমশিল্পের ধ্বংস আর বিদেশী বণিক সরকারের নির্মম শোষণ।

> ঢাকা, ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার্, উন্নত অবস্থা থেকে নেমে গেছে দারিদ্র্যে ; সেখানে অপরিসীম দুঃখকষ্ট।
>
> —চার্ল্স ট্রেভল্যান্, ১৮৪০

> এই অধোগতি শুধু ঢাকায় নয়, অন্যান্য জেলাতেও।
>
> —হেন্‌রি কট্‌ন্, ১৮৯০

> আমি স্বীকার করি না যে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ; কৃষি ও শ্রমশিল্প সমভাবেই তার ছিল......
>
> —মণ্ট্‌গোমারি মার্টিন্

কাঁচা মাল সরবরাহ করা আর ইংরেজের তৈরি মাল কেনার জন্য ব্রিটিশ্ ধনতন্ত্রের চাপেই ভারত ও বাংলা হয়ে পড়েছে কৃষিপ্রধান।

১৯১৪-১৮র মহাসমরের পর তৃতীয় পর্যায় আরম্ভ হল। পুরানো পদ্ধতিতে নানা রকম শোষণ মোটামুটি বজায় রেখে নতুন পদ্ধতিরও সৃষ্টি হল—অর্থাৎ লুণ্ঠিত অর্থের খানিকটা অংশ শ্রমশিল্পের মূলধনে লাগিয়ে এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প ইংরেজ নিজের মুঠোয় এনে ফেলল। কিন্তু সব সময়েই তার নজর ছিল যেন শ্রমশিল্পের প্রসার কম হয়। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও নিজের শত বিপদ্ সত্ত্বেও ইংরেজ এই নীতি ছাড়েনি। অ্যামেরিকান্ টেক্নি-ক্যাল্ মিসনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ইংরেজ এ দেশকে পিছিয়ে রেখেছিল, অথচ ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে শ্রমশিল্পপ্রসারের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। মহাযুদ্ধের গুরু অর্থনৈতিক ভার ভারতের ওপর চাপল, ভারতের ঋণও ইংরেজ শোধ করল না। স্বাধীনতার সময়েও ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে ইংগ-মার্কিন মূলধনের প্রভুত্ব অটুট রইল।

সমগ্র 'ব্রিটিশ্' ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৭৫ কোটি পাউণ্ড (১৯৩৮-৩৯); তার মধ্যে ৫৭ কোটি শুধু বাংলা দেশেই, অর্থাৎ শতকরা ৭৬ ভাগ। আবার বাংলার জয়েণ্ট্ স্টক্ কোম্পানির সমগ্র মূলধন প্রায় ৮৯০ কোটি টাকা আর এর মধ্যে বিদেশী মূলধন ৭৭০ কোটিরও বেশি, অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৮৬ ভাগ। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে বাংলার অর্থনীতি কী ভাবে এখনো বিদেশীর হাতে রয়েছে। শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ মূলধন নিয়ে বাঙালী ও অবাঙালীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ। অথচ সেই প্রশ্নই আজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। বংগবিভাগের মূলে এই মূলধনের স্বার্থ একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ১৯৪৬র

জুলাই মাসেও ড্যাল্‌টন্ পার্লামেন্টে বলেছেন যে বৃটিশ মূলধনের বিশেষ কিছুই ভারতীয়দের হাতে যায়নি ; বরং নানা ভাবে আজ বিদেশী মূলধন ভারতে প্রবেশ করছে।

১৯৩৯র মহাযুদ্ধ হল এক মর্মান্তিক ঐতিহাসিক শিক্ষার বাহন। মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি দুর্ভিক্ষ চোরা কারবার কৃষক জাগরণ বিদ্রোহী শ্রমিক আন্দোলন ও খণ্ডিত স্বাধীনতার জটিল অর্থনীতি—বিপর্যয়ের এই ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রমাণিত হল সর্বাংগীন নিঃস্বতা। আজ বিত্তহীন মধ্যবিত্ত অসন্তোষের স্রোতে ভেসে চলেছে চাষী মজুরের আশে পাশে। পুরানো বন্দর ভেঙে গেছে, এবার ভাসো নতুন দিনের আশায়। কিন্তু ইতিহাসের বিরাট প্রাসাদে ঘরছাড়া হয়ে নতুন ঘর খুঁজে নিতে সময় তো কিছু লাগবেই। তাই আগামী দিনের স্বস্তি ও স্বাস্থ্যের আগে বর্তমানে চলেছে চিত্তবিভ্রম আর আত্মগ্লানি, সন্ধানের হতাশ অবসাদ।

৫ :   সংস্কৃতির ধারা

'সংস্কৃতি' বস্তুটিকে এক কথায় প্রকাশ করা বা বোঝানো শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় অসম্ভবও। ব্যাপক অর্থে 'সংস্কৃতি' বলতে একটা জাতির সমগ্র মানস চর্চা ও কর্ম-সাধনার যুক্ত ফল হতে পারে। সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি ধর্ম সাহিত্য বিদ্যা শিল্প ও কলা—এ সব ব্যাপারই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা চলে। তাই একটা জাতির সমগ্র সত্তার পরিচয় মেলে তার সংস্কৃতিতে। বাঙালিত্ব তাই বাঙালীর সংস্কৃতির সংগে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত, আর বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বা বাঙালিত্বের পরিচয় তো আমরা আগেই পেয়েছি। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতীয় কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, কোনো বিরোধী সম্পর্কেরও সৃষ্টি করেনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম। ভারতের উঁচু নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশা-পাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায়নি।.. ... এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসংগতির সাধনাই হল ভারতের বিশেষ সাধনা। নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধনাই ভারতের ব্রত।
>
> —ক্ষিতিমোহন সেন : 'বাংলার সাধনা'

সংস্কৃতির রূপ

বাঙালীর মন যে ভাবপ্রবণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালী শুধু ভাবুক নয়, শুধু অনুভূতি তার পাথেয় নয়। জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও গবেষণায়, কর্মে ও সংগঠনেও বাঙালী তার সাধনার

পরিচয় যুগে যুগে বার বার দিয়েছে। বিগত হাজার বছরের ইতিহাসে বিপর্যয় ও বিপ্লব, সংকট ও সর্বনাশের প্রহর অনেক বার এসেছে এবং একটা দৃঢ় অলক্ষ্য অধ্যাত্মশক্তির ভিত্তিতেই বাঙালী চরিত্র আত্মরক্ষা করে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অপরকে সচেতন করে রেখেছে। বাঙালী সংস্কৃতির অখণ্ড রূপের প্রধান কারণ এই যে জাতিগত ঐক্যের সংগে এখানে মিশেছে ভাষাগত ঐক্য। আর এই ব্যাপারটি ঘটেছে মধ্য যুগে। প্রাক্-ইসলামিক যুগে বাঙালী সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও মোটামুটি ভারতীয় কাঠামোই বজায় রেখেছিল। আজ সেই কাঠামো একেবারে বদলে গেছে এমন কথা বলা চলে না, তবে এটা ঠিক যে মধ্য যুগে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে রূপান্তরের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আর ইংরেজী আমলে সাধনার ধারায় মোড় ফিরে গেছে।

বাঙালী সংস্কৃতি ও ইসলাম

তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতির সংগে ইসলামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের যৌথ অবদানে গঠিত ব্যাপক হিন্দুত্ব গজিয়ে উঠেছে ভারতের মাটিতে। কিন্তু ইসলামের জন্ম অন্যত্র এবং সেইজন্যই ইসলামের মনোভংগীও স্বতন্ত্র। তার তেজ, তার গণতান্ত্রিক সাম্যবোধ, তীব্র বিশ্বাস ও নবজাগ্রত বিজয়ী উন্মাদনা প্রাচীন ভারতীয় মনের কাছে একাধিক ভাবে অভিনব ছিল। কিন্তু প্রায় পাঁচ শো বছর ধরে এই শাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম বাংলার মাটিতে মধ্য প্রাচ্যের উগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। মাটি ও জল, হিন্দু রক্তের প্রাধান্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বহুপ্রাচীন বিধর্মী ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রভাব—এই সব কারণে বাংলার মুসলমান দেশজ ও স্থানীয় সভ্যতার অংশীদার ও উত্তরাধিকারী হয়েছিল। মুসলমানী প্রভাবে বাংলার প্রাচীন কাঠামো কোনো সময়েই সমগ্র ভাবে পরিবর্তিত হয়নি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ

ইসলামী ভাবধারাকে প্রতিরোধ করবার প্রয়াসী হয়েছিল, কিন্তু বাংলা করেছিল পরিপাকের চেষ্টা তার সমীকরণের অপরূপ শক্তিতে।

বাংলায় এই সমন্বয়ের কারণ কী? প্রথমত শরীয়তী মতের পরিবর্তে সুফী মতের প্রভাব। সুফী মতের সংগে বাংলার সাধনার সহযোগিতা সহজেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই সহযোগিতা ও রাজধর্মের আভিজাত্য সত্ত্বেও খাঁটি মুসলমানী উপাদান বাংলার উচ্চতর সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিশিষ্ট মুসলমানেরা আরবী ও ফার্সির চর্চাতেই নিমগ্ন ছিলেন, বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে ইসলামী কৃষ্টি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেননি; বরং হিন্দু সংস্কৃতিকেই সাহায্য করেছেন। সাধারণ শিক্ষাদীক্ষাহীন ধর্মান্তরিত মুসলমান তাই লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যেই ইসলামী ভাবধারার সন্ধান করেছে। এ ব্যাপার অতি সহজেই হয়েছে, কারণ ব্রাহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধ ও অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুই প্রধানত মুসলমান হয়েছে। তাদের রক্তের ঐতিহ্য ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পেরে দেশজ সংস্কৃতির মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছে। এই ভাবে প্রধানত সমন্বয়ের পথে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি।

ইসলামের মধ্যে সাম্যভাব থাকলেও মুসলমান সমাজে শ্রেণীগত পার্থক্য ও তার সংগে সংস্কৃতির বৈষম্য খুবই দৃষ্টিকটু। বাংলার মুসলমান সমাজে অভিজাত ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়ে গেছে স্থায়ী ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভাবে। মধ্য যুগে নবাবী আমলেও তাই গণকৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলমানের অবদান থাকলেও উচ্চতর সংস্কৃতিতে তার দান ও দাবী স্বল্প। আর ইংরেজের যুগে তো লোকসংস্কৃতি নষ্টই হয়েছে, উচ্চতর সংস্কৃতি সৃষ্ট হয়েছে হিন্দুর সাধনায়, আর এই দিক দিয়ে বাঙালী মুসলমান নিঃস্ব হয়ে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলার নবজাত মুসলিম মধ্যবিত্ত বাঙালিত্ব বর্জন করে বৃহত্তর মুসলিম জগৎ না হয় অন্তত

'উর্দু'-সংস্কৃতি'র মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করবার চেষ্টা করল। এ শুধু দৈন্যস্বীকার নয়, আরবী ভাষাকে মাতৃভাষা বলে অবলম্বন করার মতোই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রয়াস। এ চেষ্টা পারস্যের মুসলমানেরা করেনি; তুর্কির মুসলমানেরাও ইরানী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতি গঠন করে চলছে। বাংলার মুসলমানের পক্ষে মধ্য প্রাচ্যের এমন কি পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংস্কৃতির অনুকরণ আত্মঘাতী হবে। বাঙালীর আগামী সভ্যতার ভিত্তি হওয়া উচিত হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সাধনা যার ফলে বাঙালীর সমীকরণের ক্ষমতা সারা পৃথিবীর কৃষ্টিকে আত্মসাৎ করে নিতে পারবে। তা না হলে বাংলার বর্তমান সংকট হবে ভবিষ্যতের অপমৃত্যু। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের মতো এই সাংস্কৃতিক বৈষম্যও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ইন্ধন যুগিয়েছে।

যুগ ও পর্বের ধারা

বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে মোটামুটি তিনটি যুগ দেখা যায়:
(১) প্রাচীন যুগ (খৃষ্টীয় ১২০০ পর্যন্ত)—ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ, যার দুটি পর্ব হচ্ছে আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয় ও ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতি সমন্বয়ের ব্যাপক হিন্দু রূপ;
(২) মধ্য যুগ (খৃষ্টীয় ১২০০ থেকে প্রায় ১৮০০ পর্যন্ত)—হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি-সমন্বয়, যার দুটি পর্ব দেখি পাঠান যুগে আর মোগল যুগে;
(৩) আধুনিক যুগ (১৮০০ থেকে শুরু)—প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি বিরোধ ও সংস্কৃতি সমন্বয়, যার তিনটি পর্ব স্পষ্ট বোঝা যায়: ১৮০০-১৮৫৭; ১৮৫৭-১৯১৯; ১৯১৯ ১৯৪৭।

বছরের হিসাবে এই যুগ ও পর্ব বিভাগ যে খানিকটা কৃত্রিম সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু তা হলেও এতে ক্রমবিকাশ ও ইতিহাসের ধারা বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয়।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের মধ্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভেদ থাকলেও ব্যাপক ভাবে এ দুটির অখণ্ডতাও স্পষ্ট। এখানে শিকড় রয়েছে দেশেরই মাটিতে, সংস্কৃতিও তাই দেশজ। ফলে প্রাচীন ও মধ্য যুগের মধ্যে কোনো স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায় না; ইসলামী দানও সমীকৃত হয়ে দেশীয় কৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতি অনেক দিকেই ভারতীয়তা ও বাঙালিত্বকে অতিক্রম করেছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে। এর মৌলিক রূপটি দেশজ নয়, সমন্বয়ের চেষ্টা থাকলেও বিরোধী ভাবটিও সহজেই নজরে লাগে। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বিভিন্ন পর্বগুলির মধ্যে কোনো দৃঢ় পার্থক্য দেখা যায় না; অর্থাৎ প্রাচীন যুগের দুটি ও মধ্য যুগের দুটি পর্ব মোটামুটি ক্রমবিকাশেরই পর্যায়। কিন্তু দেড় শো বছরের আধুনিক সংস্কৃতি মূল ভারতীয় ধারা থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়েই গড়ে উঠেছে। এর বিভিন্ন পর্ব বা পর্যায়গুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধও দেখা যায়--যেমন উনিশ শতক ও বিশ শতকের ভাবধারায়, ইংরেজী অনুকরণে ও ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তা-বাদে। আধুনিক সংস্কৃতির সংগে বৈদেশিক রাজনীতি ও অর্থনীতিও জড়িয়ে গেছে। কিন্তু তা বলে আধুনিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। এই যুগেই বৃহত্তর কৃষ্টি-জগতের সন্ধান মিলেছে, এই যুগেই হয়েছে ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সূচনা।

এ ছাড়াও আরো কয়েকটা ব্যাপারে তুলনা করলে প্রভেদ সহজেই ধরা পড়ে। পুরানো লোকসংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গ্রাম্য জীবন। আজো তাই গ্রামেই সে ধারার অবশেষ দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে লোক-সংস্কৃতির নতুন কোনো ধারাই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, অর্থনৈতিক পথে বিপ্লবী ইংগিতের মধ্যে আগামী কৃষ্টির সূচনা বা সম্ভাবনাই শুধু বোঝা যায়। আগে উচ্চতর সংস্কৃতি নাগরিক জীবনের সংগে জড়িত ছিল

গ্রাম্য জীবনকে অস্বীকার না করেই। কিন্তু এখনকার কৃষ্টি পরিপূর্ণ ভাবেই নাগরিক এবং গ্রাম্য সভ্যতার সংগে এর যোগসূত্র প্রায় অদৃশ্য।

প্রাচীন ও মধ্য যুগের সংস্কৃতি ছিল মূলত দেশজ, দেশের মাটিরই ফসল। কারণ ইসলাম কিছু কিছু নতুন ভাবধারা আনলেও শাসক মুসলমান উন্নততর কোন কৃষ্টি আনেনি, বিজিতেরাও নিজেদের সভ্যতায় আস্থা হারায়নি। আর তা ছাড়া মুসলমানেরা এ দেশেরই অধিবাসী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতির মূলে রয়েছে ভারতীয় সভ্যতায় বেশ খানিকটা অনাস্থা, আর এর কাঠামোয় রয়েছে পাশ্চাত্ত্য সমাজ বিজ্ঞান ও ভাবধারার স্পষ্ট প্রভাব। ইংরেজ এখানে বণিক-শাসক সম্প্রদায় হিসাবে স্বতন্ত্র হয়েই থেকেছে, আর নতুন ভাবধারায় আমরাও অনেকটা বিহ্বল হয়ে গেছি। কিন্তু তা বলে এই সংস্কৃতিকে শুধু 'ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি' বা পরাধীন জাতির সংস্কৃতি বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এটা আমাদের কাছে একটা বাস্তব লাভ, একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক আলোড়ন। তাই সাময়িক ভাবে বিচলিত হলেও অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সৃষ্টিক্ষম সমন্বয়ের পথে চলা ক্রমশই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে।

অতীত সংস্কৃতিতে সমাজের সব শ্রেণীরই দান রয়েছে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে। কিন্তু ইংরেজী আমলের যে শিক্ষাদীক্ষা সেটি মূলত মধ্যবিত্ত। অবশ্য মধ্যবিত্তের এই সাধনা যে সমাজের অন্য স্তরে পৌঁছয়নি এমন কথা বলা যায় না, আর তা ছাড়া এ সাধনার গৌরবও অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু আবার এ কথাও ঠিক যে আধুনিক যুগে সারা দেশের ব্যাপক লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশ হয়নি, বরং দৈন্যই দেখা দিয়েছে। আমরা ভুলেছি অনেক কিছু, অবহেলায় নষ্টও করেছি অনেক কিছু। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কালান্তরীয় সংকটও আজ তাই স্পষ্ট ; ইংরেজের গড়া মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি তাই ইংরেজের তিরোভাবের আগে থেকেই এত বিপন্ন।

ইংরেজী আমলের বাঙালী সাধনা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি লোকসংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত না করে, লোকশিক্ষার প্রচার না করে নবলব্ধ চেতনাকে দিয়েছিল একটা 'হিন্দু মধ্যবিত্ত' রূপ। এ ধারণা খানিকটা সত্য হলেও সবটা নয়। এই সংস্কৃতিতে এমন অনেক কিছু ছিল যার আবেদন কোনো মতেই সাম্প্রদায়িক নয়, যার মূলে ছিল জাতীয়তা। মুসলমানী আমলেও হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষা অল্পই ছিল, আর ইংরেজশাসনের সময়ে নৈরাশ্যাভিমানী বিজিত মুসলমানের নতুন শিক্ষা থেকে দূরে থাকার চেষ্টাও মারাত্মক হয়ে উঠল। ফলে আধুনিক সংস্কৃতি গড়ে উঠল হিন্দুর হাতে, মুসলমানের দান হল অল্প। যৌথ সংস্কৃতি শুধু এক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় হয় না। তা ছাড়া আধুনিক সংস্কৃতি যে মূলত মুসলিম-বিরোধী এমন কথাও বলা চলে না। আর এর 'হিন্দুত্ব' খুব ব্যাপক ভাবেই 'হিন্দু' অর্থাৎ ভারতীয় বা দেশজ—অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই। হিন্দুর দোষ হয়েছিল মুসলমানকে সংগে টেনে না নেওয়া; আর মুসলমানের দোষ তার গোঁড়ামি আর শিক্ষা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য। গোপাল হালদারের অনুসরণে 'হিন্দুর ভুল' বলে সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না। যৌথ কৃষ্টির অভাবে জাতীয়তা সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করতে পারেনি, সংস্কৃতির বৈষম্যও পরে মারাত্মক হয়েছিল। তারই ফসল আজ ভাঙা বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংকট।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম ফল হল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরাতনের পুনরুজ্জীবন, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে সরিয়ে তার জায়গায় ভারতীয় ও বাঙালী সংস্কৃতির 'স্বদেশী' মূর্তির প্রতিষ্ঠা। অবশ্য আবার এর সংগে সংগেই বৈদেশিক সভ্যতাকে পরিপাক করে জাতীয় কৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করে তোলবার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু ১৯১৪র মহাযুদ্ধের পর থেকে সমস্ত পৃথিবীতে যে নতুন বিপ্লবী ভাবধারার আবির্ভাব হল, যার অর্থনৈতিক চেতনা সংঘাতে প্রাচীন

সমাজব্যবস্থা হল অস্থির তারই প্রভাবে বর্তমান সংস্কৃতি চলেছে নতুন পথে। এই অভিনবত্ব শুধু ভাবের আবেগ নয়, এর মূলে রয়েছে অর্থনীতি ও সমাজনীতির পুঞ্জীভূত ও মিলিত ঐতিহাসিক শক্তি। সংকটাপন্ন মধ্যবিত্ত এই ঐতিহাসিক শক্তির তাগিদেই নেমে আসছে গণসমাজের স্তরে। নতুন সভ্যতার এই বিপ্লবী সূচনা নির্দেশ করছে যে আগামী সংস্কৃতি হবে প্রাচীন সাধনা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক। এই দিক দিয়ে ইংরেজী আমলের শোষণের আঘাত যে আমাদের নব চেতনার সম্ভাবনা এনেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কার্ল্ মার্কস্ তাই বলেছেন যে বৃটিশ শাসকদের সম্বন্ধে ভারতীয়দের গভীর ঘৃণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আবার ভারতের স্বৈরতন্ত্র গ্রাম্য সমাজপদ্ধতিও ভারতের অগ্রগতিতে বার বার বাধা দিয়েছে কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার সৃষ্টি করে। এই গ্রাম্য সমাজের পরিবর্তনের সূচনা করেছে ইংরেজী শাসন ; তাই শত অপরাধ সত্ত্বেও এ দেশের সমাজ-বিপ্লবের দায়িত্বের জন্য ইংরেজী আমলের মূল্য রয়েছে, ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন বাঙালীর সংস্কৃতি মূলত ভারতীয়, অর্থাৎ বাঙালীর অবদান ও সাধনার মূল্য যথেষ্ট থাকলেও তার কৃষ্টি ভারতীয় ধারাকেই অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল, নিজস্ব মৌলিকতা খুব বেশি ছিল না। তার প্রধান কারণ এই যে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বংগ এক হয়ে একটি ভাষার মাধ্যমে চিন্তা করতে শেখেনি। এ যুগে উচ্চতর সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি দুইই ছিল, কিন্তু তার ধারাবাহিক ও অখণ্ড ইতিহাস মেলে না।

সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য থাকলেও ধীরে ধীরে বৌদ্ধ-ধর্ম ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যবিরোধী মতবাদ গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার এক কালে বাংলায় যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির

ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়নি। বৌদ্ধ যুগে সামাজিক মনোবৃত্তির পরিবর্তন একটু স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় এবং তার ফলে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। এ যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে মোটামুটি অবিরোধী সম্পর্ক থাকার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েরই অবদানে যৌথ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল।

সংস্কৃত পালি ও অন্যান্য প্রচলিত ভাষায় গ্রন্থ রচিত হত। সাহিত্যের নিদর্শন অল্প হলেও জয়দেব ও ধোয়ীর রচনা, চর্যাপদ ও কৃষ্ণবিষয়ী কাব্য উল্লেখযোগ্য ; লৌকিক সাহিত্যও নিশ্চয়ই ছিল যদিও তার উদাহরণ পাওয়া কঠিন। আর্য সংস্কৃতির প্রসারের সংগে সংগেই বৈদিক চর্চার আরম্ভও বাংলায় হয়েছিল। পূর্বমীমাংসার চর্চায় পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন শালিকনাথ ভবদেবভট্ট হলায়ুধ প্রভৃতি। সাংখ্যের প্রবর্তক কপিলও নাকি ছিলেন বাঙালী। ন্যায়-বৈশেষিকে বাঙালীর দান উজ্জ্বল।

বৌদ্ধ মহাযান মতের বহু আচার্যই বাঙালী। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ শীলভদ্র, তিব্বতের ধর্মগুরু দীপংকর ও শান্তরক্ষিত প্রভৃতির নাম আজো খ্যাতি অর্জন করছে। হীনযান মতের আচার্য রামচন্দ্র কবি-ভারতী সিংহলে আজো গুরুস্থানীয় ও পূজ্য। লুইপাদ ও তাঁর অনুসরক সিদ্ধাচার্যেরা সহজযানী এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন এবং তিব্বতে এখনও তাঁদের পূজা হয়। ভুটিয়া ভাষায় এঁদের রচনার অনুবাদ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের শৈব সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ের শ্রীকণ্ঠশিব শ্রীকণ্ঠশম্ভু ও শিবাচার্য বিশ্বেশ্বর। স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রাচীন যুগেও বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিজ্ঞানচর্চাতেও বাঙালী পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। আয়ুর্বেদের আলোচনা এ দেশে ভালো ভাবেই হত এবং হস্তিচিকিৎসায় বাঙালীই ছিল ভারতে অগ্রগণ্য। শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষত বস্ত্রশিল্পে, প্রাচীন যুগ

থেকেই বাংলার প্রসিদ্ধি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায় যে রেশম বাকল ও কার্পাসের কাপড় এখানে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

নৃত্যগীতচর্চায় প্রাচীন বাঙালীর নাম ছিল, বসনভূষণেও। প্রেক্ষাগৃহ ও অভিনয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় বাঙালী সংস্কৃতি এ দিকেও বেশ অগ্রসর হয়েছিল। ওড্রমাগধী রীতিই ছিল এখানে বিশেষ ভাবে প্রচলিত।

ধ্বংসাবশিষ্ট শিল্পকলা থেকে বাংলার গৌরব সহজেই বোঝা যায়। স্থাপত্যশিল্পে পাথরের পরিবর্তে ইটের ব্যবহারই এখানে প্রচলিত ছিল। আর্দ্র আবহাওয়া নদীবিপ্লব ও বৈদেশিক আক্রমণকারীর অত্যাচার তাই সহজেই এ দেশের স্থাপত্য-নিদর্শন নষ্ট করে ফেলেছে। কিন্তু ফা-হিয়ন্ ও হুয়েন্-সাং এর গৌরব তাঁদের বিবরণে লিখে গেছেন। হিন্দুমন্দির বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধবিহারই বাঙালী স্থাপত্যের সেরা নিদর্শন এবং পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ থেকে আজো স্থাপত্য-সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। ভারতীয় ভাস্কর্যের মতো বাঙালী ভাস্কর্যও প্রধানত দেবদেবী ও দৈত্যদানবের মূর্তির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু মূর্তিগুলির কমনীয় ভংগী ও শ্রী বাংলার বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। পাথর ও মাটির ফলকে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার ছন্দ বিচিত্ররূপে ফুটে উঠেছে —কূয়ো থেকে জল তোলা, লাঙল কাঁধে চাষা, বাজীকরের খেলা, শীর্ণ-সন্ন্যাসীর পথ চলা, পূজারী বামুন, শিকারীর দর্প। সহজ অনায়াস ও অকৃত্রিম এই শিল্পপদ্ধতির মধ্যে প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধের সংগে সামাজিক জীবনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার চিত্রশিল্পের উদাহরণ অল্পই পাওয়া গেছে। কিন্তু এখানেও রেখাবিন্যাস ও বর্ণসমাবেশের মধ্যে বাঙালী কমনীয়তা ও শ্রীবোধ স্পষ্ট। বাঙালী চিত্রশিল্পের প্রভাব আসাম থেকে আরম্ভ করে দূর প্রাচ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে ওঠে মধ্য যুগেই, যদিও প্রাচীন যুগের সংগে এর যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন। হিন্দু বৌদ্ধ ও মুসলমানের ভাবসমন্বয়ে ও রাষ্ট্রীয় কারণে এর জন্ম। এ যুগে বাংলা ভাষাও একটা বিশিষ্ট ও মোটামুটি স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে এবং কৃষ্টিগঠনে এর দানও অসামান্য। পাঠান আমলে ভারতীয় কেন্দ্র থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালিত্ব একটা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিল, কিন্তু তা হলেও বাঙালী সংস্কৃতির সংগে ভারতীয় কৃষ্টির কোনো বিরোধী সম্পর্ক ছিল না। তার প্রমাণ মধ্য যুগের শ্রীচৈতন্য। মোগল আমলে বাংলা আবার যুক্ত হল কেন্দ্রে, আর এই সময়ে বিদেশী বণিকদের আবির্ভাবে জীবন ও চিন্তার পরিধিও হল বৃহত্তর। মোগল আমলে বাঙালীর লাভ-লোকসান দুইই হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে হল ক্ষতি, কারণ অর্থ চলল দিল্লিতে, কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রদেশের সংগে বাংলার ভাবের আদানপ্রদানের সম্পর্ক হল ঘনিষ্ঠ।

সংস্কৃতির চর্চা অনেকটাই হত সুলতানী দরবারের পোষকতায়। পৌরাণিক সাহিত্য ও কৃষ্ণলীলাসংক্রান্ত কাব্য ও সংগীত এই ভাবেই বিকশিত হয়েছিল। হোসেন শাহ পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর গুণগ্রাহিতার কাছে বাঙালীর ঋণ থাকবেই। স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন হিন্দুরাজারাও সংস্কৃতির পোষকতায় পশ্চাদ্‌পদ ছিলেন না।· কুচবিহার বিষ্ণুপুর ইত্যাদি স্থানে এবং বিভিন্ন জমিদারদের আশ্রয়ে কৃষ্টিবৈচিত্র্য রচিত হয়েছিল। সংস্কৃতির সেবকদের তালিকায় রূপ ও সনাতন এবং গুণরাজ খাঁ (মালাধর বসু) প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর সবার ওপরে অবশ্য স্থান পাবে শ্রীচৈতন্যের বিরাট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে রামকেলি নবদ্বীপ শান্তিপুর ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি জায়গার প্রসিদ্ধি

থাকলেও বেশ একটা প্রাণবন্ত কৃষ্টিসাধনার ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাংলায়, শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে।

ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চায় বাংলার উচ্চতর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রঘুনন্দন রঘুনাথ প্রভৃতি সুধীর নাম অবিস্মরণীয়। আর নব্যন্যায়ে বাংলা তো ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়। নীচ জাতিও শাস্ত্রচর্চা থেকে বঞ্চিত ছিল না। দক্ষিণ রাঢ়ে এখনো ডোম বাগ্দী পণ্ডিতের টোল আছে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার প্রচলন ছিল। গ্রামে নিরক্ষরতা ছিল, কিন্তু নিরক্ষর চাষীরও সাধারণ জ্ঞান বা শিক্ষার অভাব ছিল না। শুভংকরী গণিত উচ্চতর সংস্কৃতির নিদর্শন হলেও সাধারণের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান বেশ উচ্চ স্তরেরই ছিল ; এ ছাড়া সাধারণ লোকেরা ও গ্রামের মেয়েরা বহু উদ্ভিজ্জ ওষুধের প্রয়োগ জানত। হট্‌ন্ ও লং উচ্ছ্বসিত ভাবে এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্য-বোধের প্রশংসা করেছেন।

'সেক শুভোদয়া', 'শূন্যপুরাণ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'কবিকংকন চণ্ডী' ইত্যাদি এ যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। শেষের দিকে এলেন কাশীরাম, কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র। শাবিরিদ খাঁ দৌলৎ কাজী আলাওল প্রভৃতি মুসলমান কবিরা হিন্দুদের সংগে সংগে এ যুগের সাহিত্য রচনা করেছেন। আরব্য উপন্যাসের গল্প ও মধ্য প্রাচ্যের নানারকম রোম্যান্স্ আখ্যায়িকা মুসলমান লেখকদের হাত দিয়েই বাংলা উপন্যাসের আদিযুগ রচনায় সহায়তা করে। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতির পরিচয় শুধু মুসলমান লেখকদের রচনায় নয় মুসলিম জনসাধারণের চিত্রেও মেলে। বৃন্দাবন দাস লিখছেন :

যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে
নির্ভরে শুনিলে যাহা কান্দয়ে যবনে।

যবনেহ যার কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে।

লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় পাঁচালি আর তর্জায়, যাত্রা-অভিনয়ে আর ধর্মঠাকুরের গাজনে, কবিগান আর খেউড়ে। খাঁটি বাঙালী গানের ধারা চলতে থাকে কীর্তন ও বাউলে, জারি-সারি-ভাটিয়ালি-বেদে গানে আর শ্যামাসংগীতে। লোকসাহিত্যের অপরূপ নিদর্শন মেলে গীতিধর্মী পল্লীকাব্যে।

মধ্য যুগে বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল নানা রকম কারুশিল্প ও কুটিরশিল্পে। মসলিন রেশম মৃৎশিল্প সোনা রূপা-কাঁসার কাজ কাঠের কাজ—এ সমস্তই সারা ভারতের বাইরেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ ছাড়া চামড়ার কাজ বেতের কাজ লোহা ও ইস্পাতের অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণ ও নৌশিল্প ইত্যাদিরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। অংকন ও ভাস্কর্য প্রভৃতি চারুশিল্প এবং স্থাপত্যেও বাঙালী সাধনার গৌরব বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। হ্যাভেল্ সাহেব বলেন যে ভারতে মোগল ও পাঠান শিল্প আসলে হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পেরই রূপান্তর এবং হিন্দু শিল্পীদের গড়া মুসলমানী মসজিদের তুলনায় আরব তুর্ক মিশর ও স্পেনের মুসলমানী শিল্প ক্ষীণপ্রভ হয়ে পড়ে। মধ্য যুগের হিন্দু শিল্পীদের প্রতিভা স্বীকার করে আবুল্ ফজল্ লিখেছেন : 'এদের চিত্রাংকন পদ্ধতি আমাদের ধারণার অতীত।' মধ্য যুগের ভারতীয় শিল্পে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বচ্ছন্দ অনায়াস প্রাণবন্ত ভংগী ও গতি; এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মোগল যুগের ভারতীয় শিল্পের কৃত্রিম সূক্ষ্মতা ও আদব-কায়দার বিরুদ্ধে একটি সজীব আবেগময় লীলায়িত বিদ্রোহ।

আধুনিক সংস্কৃতি

আধুনিক সংস্কৃতির দুর্বলতা সত্ত্বেও এর ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। এ যুগে প্রাচীন ও মধ্য যুগের লোকসংস্কৃতি মরেনি,

এখনো গ্রাম্যজীবনে বেঁচে আছে, যদিও তার অনেক প্রথা ও পদ্ধতি আজ লুপ্তপ্রায়। তবে এ কথা ঠিক যে নতুন কোনো লোকসংস্কৃতি এ যুগে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। উচ্চতর কৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং সেই পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে দেশজ কৃষ্টির বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আবির্ভাব। আধুনিক সংস্কৃতির বাহন তাই প্রধানত বিদেশী ভাষা ও এর আত্মা হচ্ছে বৈদেশিক সভ্যতা। পূর্ববর্তী ধারা থেকে এই গভীর বিচ্ছেদের মূলে রয়েছে আধুনিক যুগের সমগ্র ইতিহাস শাসনপদ্ধতি ও চিন্তাধারায় ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। ফলে আধুনিক সংস্কৃতির অনেকটাই দেশজ নয় এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে পরিপাক করে নেওয়াও দেড় শো বছরে সম্ভব হয়নি। কিন্তু শত ত্রুটি থাকলেও আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি হচ্ছে সারা ভারতের নব জাগৃতির ইতিহাস ও সম্পদ এবং এর জন্য প্রধানত দায়ী বাংলার ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু নাগরিক।

মধ্য যুগে বাংলার বৃহত্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল গৌড় নবদ্বীপ ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, যদিও বৈষ্ণব কবিরা নবদ্বীপের মাহাত্ম্য সম্বন্ধেই বেশি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে বাঙালীর প্রায় সমগ্র সাধনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতায়। সারা বাংলা কলকাতার দিকেই চেয়ে থাকে। ১৯৪৭র বাংলাবিভাগের ফলে ঢাকা একটি রাজধানীতে পরিণত হলেও একাধিক কারণে ভারতের অন্যান্য শহরের মতোই তার পক্ষে আধুনিক মহানগরী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। অর্থনীতি ও বিজ্ঞান, গণতন্ত্রের আদর্শ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাধীন চিন্তার সুযোগ—এই সমস্তই বাংলায় এই মহানগরীর সৃষ্টির ফল এবং এর জন্য সারা ভারতও অগ্রসর হয়ে গেছে কৃষ্টির পথে। মহানগরীর সভ্যতা আধুনিক যুগে সমগ্র বাংলার সাধনাকে আচ্ছন্ন করেছে, বিপন্নও করেছে একাধিক দিকে।

আধুনিক সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার না করেও

বলা যায় যে এর ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়, এর রূপান্তর আবশ্যক ও অনিবার্য। তার কারণ হচ্ছে বর্তমান সামাজিক জীবনের অপূর্ণতা। ১৯১৪ র মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই অপূর্ণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভের পর সামাজিক জীবনের ভাঙন ও সংস্কৃতির সংকট হল স্পষ্টতর। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল কৃষ্টির বাহন ও প্রচারক; কিন্তু এখন সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ভেঙে পড়ছে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় এবং বর্তমান পরিস্থিতির নিষ্ঠুর আঘাতে। আজো অবশ্য সাধনা চলেছে; কিন্তু সাধনার রূপান্তরও যে হচ্ছে তা বোঝা যায় শ্রেণীলোপের দ্রুতবর্ধমান সম্ভাবনায়, বিপ্লবী সমাজসৃষ্টির দাবিতে আর বামপন্থী কৃষ্টির সূচনায়।

দেড় শো বছরের আধুনিক সভ্যতা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে পরাধীনতা ও মূলগত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই সাধনা অভূতপূর্ব এবং এর জন্য সারা ভারত বাংলার কাছে ঋণী। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে বাঙালী বৈশিষ্ট্যের ছাপ স্পষ্ট থাকলেও এই বিরাট সাধনা সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত এবং সারা ভারতে সার্থক ভাবে গ্রাহ্য ও গৃহীত। এই দীর্ঘ ও বিচিত্র সাধনার মূল সূত্রগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত বিষয়ে: (১) পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে উপলব্ধি এবং প্রাচ্য সভ্যতার সংগে মিশিয়ে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ; (২) বিজ্ঞানচর্চা ও বিভিন্ন বিভাগে বৈজ্ঞানিকদের অবদান; (৩) শিক্ষার প্রয়োজনবোধ ও প্রচার, নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংগঠন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নৃতত্ত্ব ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতির চর্চা; (৪) রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনা ও আন্দোলন এবং সাংবাদিকতার প্রসার; (৫) নারীজাগরণ ও কর্মক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাব; (৬) উচ্চতর সাহিত্যের বিপুল সাধনা; (৭) প্রাচ্য ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন কলাশিল্পের সৃষ্টি ও প্রচার—অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত; নৃত্যগীত চর্চা ও তার নতুনত্ব; নাটক কথাচিত্র

ও বেতারে নতুন কৃষ্টির সম্ভাবনা ; (৮) সমাজসংস্কার ও সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় জীবনের অন্যান্য সংগঠনী সাধনা ; (৯) জড়বাদী যুগে আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতনতা—রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ; (১০) ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের অজস্র অবদান।

ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে বাঙালীর সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়—১৮০০-১৮৫৭, ১৮৫৭-১৯১৯, ১৯১৯-১৯৪৭। অবশ্য এ ধরণের পর্ববিভাগ খানিকটা কৃত্রিম হবেই কারণ রূপান্তর বছরের হিসাবে ঘটে না।

১৮০০-১৮৫৭ : এ যুগের চিন্তানায়কেরা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসে আবিষ্কার করলেন প্রাচ্য জীবনের অসম্পূর্ণতা। তাই প্রাচ্য জীবনকে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মধ্য দিয়ে নতুন করে গড়ে তোলাই হল তাঁদের সাধনা, আর প্রথমেই তাঁদের নজর গেল সমাজ-সংস্কারের দিকে। এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল, কারণ মোগল যুগের অবসানের সময়ে সারা দেশে এমন একটা মানসিক স্থবিরতা এবং সামাজিক অবনতি এসেছিল যাকে দূর করা একান্ত আবশ্যক হল। অবশ্য এই অভিযানে বাড়াবাড়ি খানিকটা হয়েছিল এবং অন্ধ অনুকরণও যে হয়নি তা নয়। কিন্তু তা হলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এ আন্দোলনের মধ্যে ছিল এক সুস্থ রূপান্তর ও গতিশীলতার ধারা।

এ যুগের বহু সাধকদের মধ্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব দেখি রামমোহনের চরিত্রে। তাই ঘরে বাইরে তাঁর প্রতিভা সমভাবেই অনুভূত হয়েছিল। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাব-ধারার সমন্বয়ে। হিন্দু-মুসলমান ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতিকে তিনি সার্থক ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন কোথায় তাঁর সমসাময়িক ভারতের গলদ আর অসম্পূর্ণতা। সেইজন্যই তাঁর চিন্তাধারা ও সাধনা সেদিনের বাংলায় বিপ্লবী মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। রামমোহন

ও তাঁর সমসাময়িক সাধকেরা তাঁদের বাঙালিত্ব সম্বন্ধে সমগ্র ভাবে সচেতন থেকেও প্রাদেশিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন এবং সেইজন্যই বাঙালীর সাধনায় হয়েছিল ভারতের নব জাগৃতি। ধর্ম-সমাজ-শিক্ষায় সংস্কার, জাতীয় চেতনার উদ্রেক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সংস্কৃতির স্থাপনা—এই ছিল রামমোহনের নব যুগের আদর্শ; অর্থাৎ একটি উদার বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে তিনি ভারতের রূপান্তর বা যুগবিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করলেন। এই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির ফলেই ব্রাহ্মধর্মের সূচনা, সতীদাহপ্রথার সমাপ্তি এবং ইংরেজী শিক্ষার ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রবর্তন। যুক্তি ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে রাম-মোহন হিন্দু মুসলিম্ কৃশ্চান্ ধর্মের কুপদ্ধতিগুলি দূর করবার চেষ্টা করলেন। ধর্ম ও সমাজের সংস্কার (বিশেষত জাতিভেদলোপ ও সাম্প্রদায়িক সমন্বয়) তাঁর কাছে জাতীয় চেতনা থেকে পৃথক ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল যে সামাজিক ঐক্য ও সুস্থ সমাজব্যবস্থার ফলেই জাতীয় চেতনা ও রাজনৈতিক মুক্তি আসবে এবং স্বাধীন ভারতের চিন্তা তিনি একাধিক পত্রে ও কথোপকথনে প্রকাশ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে চিন্তা ও বিতর্কের উপযোগী গদ্যরচনাও তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। রামমোহনের মন সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে এ দেশকে পরিচিত করেছিল বিদেশের কাছে আর বিদেশকে গ্রহণ করেছিল দেশী চিত্তের দিগন্তবিস্তারের জন্য। চীন স্পেন গ্রীস্ আয়ার্ল্যাণ্ড্ ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্স্—সর্বত্রই সংস্কার ও বিদ্রোহের আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা রামমোহনের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। স্প্যানিশ্ ভাষায় লেখা একখানি বই তাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল; ইংল্যাণ্ডে শাসক ইংরেজ সমাজেও তিনি ছিলেন গুরু-স্থানীয় ব্যক্তি। স্যার জন্ বৌরিং, রেভ্রেণ্ড্ পোর্টার, ডক্টর্ বুট্, দার্শনিক বেন্থাম্ প্রভৃতি ইংরেজরা যে ভাষায় রামমোহনকে প্রশংসা করেছেন তাতে তাঁকে মহামানব বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রামমোহন

ভারতীয় নব জাগৃতির প্রথম ও পূর্ণ প্রতীক, কিন্তু তাঁর যুগে বিরোধী লোকের অভাব ছিল না। আর এই প্রাচীনপন্থীদের তীব্র বিরোধিতার জন্যই বিরাট ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও রামমোহনের প্রভাব সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য – ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজ ও হিন্দু কলেজ। প্রথমটির মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রচুর আদানপ্রদান ও সমন্বয় হয়েছিল এবং বহু ইংরেজের সহযোগিতায় সংস্কৃতির বিকাশ দেখা দিয়েছিল প্রাচ্য গবেষণা গদ্য-রচনা ও সাংবাদিকতায়। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে হেয়ার্ কেরি মার্শ্ম্যান্ প্রভৃতি ইংরেজের দান অমূল্য। হিন্দু কলেজ গেল অন্য পথে। এখানকার চিন্তানায়ক ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ শিক্ষক ডিরোজিও। ডিরোজিওর ছাত্রেরা 'ইয়ং বেংগল্' নামে খ্যাতি ও কুখ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার বাহন। প্রাচ্য সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে ফোর্ট্ উইলিয়াম্ কলেজের ইংরেজদের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্রেরা 'স্বাধীন চিন্তা' অবলম্বন করে প্রাচ্য ভাব ও হিন্দুত্বকে এমন ঘৃণা করতে শিখল যে তাদের কেউ কেউ খৃষ্টধর্মী হয়ে পড়ল। এদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন। শিক্ষাপ্রসারে ও নারীজাগরণে বাঙালী কৃশ্চান্দের সহায়তা হয়েছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। ডিরোজিয়েরা—কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র ইত্যাদি—তৎকালীন বাংলায় বেশ একটা সাড়া এনে দিলেন। এঁদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা প্রকাশ পেল প্রধানত বক্তৃতা ও সাংবাদিকতায়। এ দুটি বস্তুরই আরম্ভ হয়েছিল রামমোহনের সময়ে এবং পরবর্তী যুগের বাঙালী ও ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি এ দুটি বস্তুরই কাছে যথেষ্ট ঋণী।

শিক্ষাব্যাপার ও সমাজসংস্কারে উগ্রতা বর্জন করে আরো দুটি

সমাজসেবী দল গড়ে উঠল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা জাতীয় ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে সমাজদৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুচরেরা নজর দিলেন শিক্ষাপ্রচার বাংলা গদ্যরচনা স্ত্রীশিক্ষা বাল্যবিবাহরোধ ও বিধবাবিবাহপ্রবর্তন প্রভৃতির দিকে।

১৮৫১ সালে বৃটিশ্ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠায় দলগত ভাবে রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের চেষ্টা দেখা গেল। অবশ্য এর আগেই রামগোপাল ঘোষের অধিনায়কত্বে 'কালো আইন' আন্দোলন হয়েছিল। এই ভাবে শিক্ষাবিস্তার সমাজসংস্কার ও অল্প রাজনৈতিক চেতনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির প্রথম পর্ব শেষ হল ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহে। আর সেই বছরেই স্থাপিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৮৫৭-১৯১৯: সিপাহী বিদ্রোহ যে বাঙালী মধ্যবিত্তের সহানুভূতি পায়নি তা বোঝা যায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রিকা প্রভৃতি তৎকালীন রচনা থেকে। সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালী সংস্কৃতি একটু স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু চেতনা আনল ১৮৫৯র নীলকর আন্দোলন যার চিত্র মেলে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে। নীলকর আন্দোলনের বিশেষ মূল্য গণচেতনার আবির্ভাবে।

দ্বিতীয় পর্বের মূল ধারাগুলি হল: ধর্মচেতনা জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক আন্দোলন শিক্ষাবিস্তার ও মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টি ও শিল্পগঠন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাব হল বাংলায়। এর একটি ধারার নেতা হলেন কেশবচন্দ্র এবং তাঁরই নেতৃত্বে ব্রাহ্ম-ধর্ম সমাজসংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠল। প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজও নিজেকে বিপন্ন মনে করে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন কি রাজনীতিতেও হিন্দুত্বের প্রচার আরম্ভ করল। হিন্দুত্বের নেতা

হলেন এ যুগে রামকৃষ্ণ, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে ও ব্যাখ্যায় সংকীর্ণতা ছিল না; তাঁর উদার মতের ফলে হিন্দুত্বের খানিকটা সংস্কার হল। রামমোহন থেকে আরম্ভ করে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের যে আন্দোলন তা যে বিশেষ সময়োপযোগী হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই আন্দোলনের চাপে বাঙালী সমাজের ও হিন্দুধর্মের সংস্কার হয়েছিল এক দিকে; অপর দিকে এর ফলে খৃষ্টধর্মের প্রসার অনেকখানি কমে গিয়েছিল। মুসলিম ধর্মমতের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এ যুগে ওয়াহাবি আন্দোলনে এবং এর প্রভাব এসে পৌঁছল রাজনীতির ক্ষেত্রেও।

রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব রোমা রলাঁর মতো পাশ্চাত্ত্য মনীষীও স্বীকার করেছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য বোধ হয় বিবেকানন্দেরই বেশি। আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ফল হল অন্য রকম। রামমোহনের মতো তিনিও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে হিন্দুত্বের প্রতিনিধি। অবশ্য বিবেকানন্দের মধ্যে প্রাচ্য গোঁড়ামি ছিল না, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংগে তুলনা করে তিনি প্রাচ্যের দোষ স্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছেন। রামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা ছিল মূলত অন্তর্মুখী, কিন্তু বিবেকানন্দ তাকে চাইলেন সামাজিক জীবনেও সার্থক করে তুলতে। ফলে আদর্শবাদী কর্মনিষ্ঠা সমাজসেবা ও দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় চরিত্রের ভিত্তিগঠন হল, বিবেকানন্দের মতে, একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবন। এ যুগের 'হিন্দু মেলা' আন্দোলন মূলত ধর্মান্দোলন না হলেও এর প্যাটার্ন ছিল হিন্দুত্বের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করা।

এ দিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং তার চরম উত্তেজনা এল বংগভংগের আন্দোলনে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই রাজনৈতিক চেতনা দলগত রূপ ধারণ

করে ও বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদে পরিণত হয় এবং তার পরে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাঙালী রাজনীতির মূল ধারা শেষ হল গান্ধিজীর আবির্ভাবে।

এর মধ্যে একটি উচ্চ স্তরের সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে এবং শিক্ষা-জগতে আবির্ভাব হয়েছে আশুতোষের এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্টি-অভিযানের। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিদ্যা-চর্চার ফলে শুধু বাঙালী সংস্কৃতি নয় সারা ভারতও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। আধুনিক সংস্কৃতির গোড়া থেকেই বাঙালীর নেতৃত্ব সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃত হয়েছিল এবং কৃষ্টির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের সর্বত্র বাঙালীর অবদান ছড়িয়ে পড়ল। ভারতে বাঙালী কৃষ্টি-নেতৃত্বের চরম অবস্থা এসেছিল বোধ হয় এই দ্বিতীয় পর্বে।

১৯১৯-১৯৪৭ : সংস্কৃতির এই পর্বে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট স্পষ্ট হয়ে উঠলেও সাধনার ধারা নানা পথে বৈচিত্র্য লাভ করতে থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির আদর্শে পরিণত হয় এবং বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন গণচেতনার সঞ্চার করে। কিন্তু এই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ফলে হিন্দু-মুসলমানের কৃত্রিম স্বার্থবিরোধ সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী রূপে সমস্ত জাতীয় জীবনকে দুর্বল করে ফেলতে থাকে। মুসলিম মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের সংগে সংগে একটা কৃত্রিম ইসলামী সংস্কৃতির সাধনা আরম্ভ হয় এবং তার ভিত্তিহীনতাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু তা হলেও একাধিক মুসলিম কবি ও লেখকের রচনায় বাংলার যৌথ সংস্কৃতি অনেকদিন পরে পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে।

সংস্কৃতির এই পর্বে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা হচ্ছে নারী-জাগরণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দিক থেকেই এই ধারার আরম্ভ এবং দ্বিতীয় পর্বে তার ফল স্পষ্ট দেখা যায়। কৃশ্চান্ ও

ব্রাহ্ম সমাজের কাছে এ বিষয়ে বাঙালী সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে ঋণী। তৃতীয় পর্বে সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে দ্রুতবর্ধমান নারী-অবদান থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে বাঙালী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বাঙালী মেয়েদের ওপরে অনেকখানি নির্ভর করছে। এই সূত্রে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে ভারতের নানা স্থানে বাঙালী মেয়েরা আজো কৃষ্টির বাহন।

সমাজসেবার যে ধারা রামমোহনের সময় থেকে আরব্ধ হয়ে বিবেকানন্দের যুগে প্রায় একটি ধর্মের মর্যাদা লাভ করে তার বিশেষ পরিপুষ্টি হয় তৃতীয় পর্বে এবং নানা রকম সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। অপর দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব-ভারতী সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য ছোটবড় নানা রকম সংস্কৃতি প্রতি-ষ্ঠান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাঙালীর মানস চর্চাকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা করে।

এই যুগের সাহিত্যিক সাধনা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী লেখকদের মধ্যে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে নতুন নতুন ভাবের গ্রহণে ও আংগিকের অনুশীলনে ব্যাপক হয়ে ওঠে। এর সংগে উল্লেখ করতে হয় দ্রুতবর্ধমান সাময়িক সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কথা। অবশ্য শেষেরটি ভেদবুদ্ধির যুগে অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দিয়ে জাতীয়তা ও সংস্কৃতির ক্ষতি করেছে। নানা রকম প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের কল্যাণে সংগীত কলাশিল্প ও নৃত্য ভারতীয় ও প্রাচ্য রীতির পুনরুজ্জীবন করে নব কৃষ্টির আন্দোলন আনে। নব নাট্য রচিত হয় আর আসে নতুন অভিনয়পদ্ধতি। কথাচিত্র ও বেতারেও ভবিষ্যৎ কৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। মূল সূত্রটি তা হলে হল এই যে মধ্যবিত্ত বাঙালী পাশ্চাত্ত্য সাধনার ব্যাপক উপলব্ধি প্রয়োগ করেছে সংস্কৃতির সমগ্র ক্ষেত্রে এবং তার সংগে চেষ্টা করেছে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাধনাকে আত্মসাৎ করে তার সনাতন সংস্কৃতিসমন্বয়ের ধারাকে সার্থক করে তুলতে। তাই এ যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উদারতার

অভাব হয়নি এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্টির সূচনা রয়েছে। এর জন্য প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বপ্রেরণাই দায়ী এবং সারা ভারত আজো বাংলার কাছে নব কৃষ্টির জন্য ঋণী।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম থেকেই বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংকট মর্মান্তিক স্পষ্টতা লাভ করতে থাকে: এর প্রধান কারণ হল সাম্প্রদায়িকতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়। তার পরে এল ১৯৩৯র মহাযুদ্ধ আর পঞ্চাশের মন্বন্তর —ভাঙনের ষোলো কলা! কিন্তু নানা রকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের পটভূমিতে নৈরাশ্যবাদ ও পরাজয়-মনোবৃত্তির সংগে গজিয়ে উঠল গণজাগরণের বিপ্লবী আদর্শবাদ আর আজ ঘুণ-ধরা মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে এই আন্দোলন গ্রহণ করতে চলেছে। এর ফল ভালো না মন্দ তার বিচার এখানে করা সম্ভব নয়; তবে একটা বিরাট ঐতিহাসিক পরির্তন যে আসন্ন তা ঘটনার পদক্ষেপ থেকেই বোঝা যায়। কৃষ্টির ক্ষেত্রে এর প্রাথমিক মূল্য রয়েছে লোকসংস্কৃতির বিপ্লবী পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনায়।

এই পর্বের ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি আনল বাঙালী জাতীয়তার অপমৃত্যু, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে ১৯৪৭র আত্মঘাতী বংগবিভাগ।

সংস্কৃতির বৈচিত্র্য

হাজার বছরের প্রায় অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের বিশ্লেষণ করলে বাঙালীর বিরাট সাধনায় যা প্রথমেই নজরে পড়ে তা হচ্ছে অজস্র বৈচিত্র্য। ভারতের আর কোনো প্রদেশে বোধ হয় সংস্কৃতির এ রকম অখণ্ড ও অপরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায় না। তা ছাড়া আর কোনো প্রদেশের সংস্কৃতি এমন সার্থক ভাবে ভারতের অবশিষ্টাংশে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই বিপুল সাধনাবৈচিত্র্যকে সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ না করে একে ব্যাপকভাবে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়— লোকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতি। অবশ্য এ দুটির পরস্পর সম্পর্ক

অনস্বীকার্য, আর তা ছাড়া লোকসংস্কৃতির অনেক বস্তুতেই সমাজের সব শ্রেণীরই স্থান রয়েছে। সুপ্রচলিত ও পরিচিত বিষয়গুলির তালিকা থেকেই বৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাবে।

লোক-সংস্কৃতি :

(১) ব্যাপক অর্থে কারুশিল্প : খড়ের চালের কুটির ; বেত ও বাঁশের কাজ ; কাঠের কাজ ; ইটের কাজ—নানা রকমের খোদাই ; নানাবিধ মৃৎশিল্প ; শাঁখের কাজ ; পিতল-কাঁসা-লোহা-ইস্পাত প্রভৃতির ধাতব শিল্প ; সোনা-রূপা-সোলা ইত্যাদির অলংকার শিল্প ; বিবিধ বস্ত্রশিল্প ; মাদুর শীতলপাটি ইত্যাদির কাজ ; হাতীর দাঁতের কাজ ও প্রস্তরশিল্প ; চিত্রকলা—নানা রকমের পট, দেয়ালে ও মৃৎপাত্রে এবং চালচিত্রে অংকন ; আলপনা ; কাঁথা সেলাই ; নৌশিল্প ও মধ্য যুগের অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণ শিল্প।

(২) অনুষ্ঠান : নানাবিধ ব্রত পার্বণ ও উৎসব—পৌষপার্বণ নবান্ন ; সামাজিক অনুষ্ঠান—বিবাহের স্ত্রী-আচার ইত্যাদি জামাই-ষষ্ঠী ভাইফোঁটা অন্নপ্রাশন বিজয়া-সম্মিলন ; পূজা—দুর্গা কালী সরস্বতী লক্ষ্মী সত্যনারায়ণ বিশ্বকর্মা ধর্মঠাকুর দোল রাস ; আনুষ্ঠানিক ক্রীড়া ইত্যাদি—রায়বেঁশে নাচ আরতি-নৃত্য ব্রত-নৃত্য ; বাংলার বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র রন্ধনরীতি।

(৩) মানসিক ও কলাগত সংস্কৃতি : বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মসংস্কৃতি—বৈষ্ণব শাক্ত সহজিয়া বাউল ইত্যাদি ; কাহিনী ও উপাখ্যান—ব্রতকথা পৌরাণিক কথকতা বেহুলা-লখিন্দর-কালকেতু-ফুল্লরা-রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ী গল্প ; সাহিত্য—ধর্মকাব্য ছড়া বচন রামায়ণ মহাভারত ও পল্লীকবিতা ; আমোদ প্রমোদ—তর্জা পাঁচালি যাত্রা ইত্যাদি ; গান—কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি রামপ্রসাদী জারি সারি ঝুমুর টপ্পা ঢপ খেমটা ইত্যাদি।

উচ্চতর সংস্কৃতি :

(১) বিদ্যাচর্চা : নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের অবলম্বনে শিক্ষাদান ও গবেষণা ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা ; বিশ্বভারতীর প্রাচ্য ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিচর্চা।

(২) ধর্ম ও সমাজ : শ্রীচৈতন্য থেকে আরম্ভ করে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ধর্ম-ও-সমাজ নিয়ে বাংলায় যে সংস্কার-সাধনা হয়েছে তার আধ্যাত্মিক মূল্য আজো সম্পূর্ণ ভাবে আলোচিত হয় নি। সংস্কৃতির এই ক্ষেত্রে প্রধান নায়কেরা হলেন শ্রীচৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ।

(৩) রাজনীতি : রাজনৈতিক সাধনার ক্ষেত্রে বাংলার অবদান আর যে কোনো প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশি। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক চেতনাই বাঙালীর সৃষ্টি। জাতীয় আন্দোলনের সব পর্যায়েই আর কোনো একটি প্রদেশ থেকে এতগুলি নেতার উদ্ভব হয় নি যেমন হয়েছে বাংলা থেকে। অসংখ্য কর্মী সাধক ও নেতাদের মধ্য থেকে যে কয়জন ভারতীয় রাজনীতিকে গঠন করেছেন বা রূপান্তর দিয়েছেন তাঁদের নাম হল সুরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন যতীন্দ্রমোহন সরোজিনী ও সুভাষচন্দ্র।

(৪) সাহিত্য : বাঙালী সংস্কৃতির অনুপম পরিচয় সাহিত্য। অন্যত্র এর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। অসংখ্য সাহিত্য-সেবকদের মধ্য থেকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে যাঁদের স্থান নিঃসন্দেহে হবে তাঁরা হচ্ছেন মধুসূদন বংকিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।

(৫) কলাশিল্প : আধুনিক ভারতে কলাশিল্পের নবজন্ম হয়েছে বাংলায়। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল ও তাঁদের অসংখ্য শিষ্যেরা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে প্রাচ্য রীতির প্রবর্তন করেছেন নতুন খাতে। বাংলার অসংখ্য শিল্পীদের মধ্যে বর্তমানে বাংলার মৌলিক পদ্ধতিকে নব রূপ দিয়েছেন যামিনী রায়।

(৬) সংগীত নৃত্য অভিনয় ইত্যাদি : রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সংগীত ও তার প্রভাবে শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতেই নব সংগীতের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন সংগীতের পদ্ধতি থেকে রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা পৃথক। এখানে স্বাভাবিক আবেগ রসানুভূতি কল্পনা ও ভাষা মিশে গেছে সুরের স্রোতে। প্রাচীন কাঠামোকে অস্বীকার করে এ গান যেন সুরলক্ষ্মীর লীলায়িত বিদ্রোহ। নৃত্যকলায় যুগান্তর এনেছেন উদয়শংকর এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়েছেন অসংখ্য শিল্পী। ভারতের এবং প্রাচ্যের নানা রকম নৃত্যপদ্ধতিকে এঁরা সঞ্জীবিত করেছেন এঁদের প্রতিভা ও কল্পনার দ্বারা। শিশিরকুমার ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনেছেন অভিনয়পদ্ধতিতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাট্যও নতুন পথের নির্দেশ দিয়েছে। গণচেতনার সূচনা দেখা দিয়েছে গণনাট্যরচনায়। ছায়াচিত্র ও বেতারও কৃষ্টির মাধ্যম হতে পারে।

(৭) প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান : উচ্চতর সংস্কৃতি যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তার লক্ষণ দেখা যায় বিভিন্ন সামাজিক ও সেবা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবে। আর একটা লক্ষণ রয়েছে বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে—নৃত্যগীতের আসর আলোচনার বৈঠক ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি

বাংলার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমন্বয়ের মৌলিক দুঃসাহস আর আর্যবিরোধী উদার মনোময়তা, মানবপন্থী ধারা ও গৃহী মনের বৈরাগী অনুভূতি, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয়তার উপলব্ধি। বাঙালীর অধ্যাত্ম-জীবন সনাতন ব্রাহ্মণ্য থেকে নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে বৈচিত্র্যে আর গূঢ় রহস্যের সন্ধানে। স্থবির আচারনিষ্ঠা তাই পরিবর্তনশীল আধ্যাত্মিক আকাংখার কাছে স্থায়ী ও সুদীর্ঘ আবেদন রাখতে পারেনি। বাঙালীর রক্তও তার ধর্মবিশ্বাসকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তার রক্তে

যে আদিম প্রাক্-আর্য তমসাচ্ছন্ন তন্ত্রসাধনার নিগূঢ় স্পৃহা রয়েছে তারই নিরন্তর তাড়নায় হিন্দু বৌদ্ধ শৈব বৈষ্ণব সব ধর্মমতই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই তীব্র আবেগ সনাতনী ধর্মে নেই।

একটা আধ্যাত্মিক অসন্তোষ ও সন্ধানস্পৃহা বাঙালী মনকে ছুটিয়েছে নতুন নতুন, গূঢ় হতে গূঢ়তর, সহজ থেকে জটিল সাধনপদ্ধতির পথে। ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের দুঃসাহসিক সমন্বয়ের চেষ্টায় তাই সময়ে সময়ে সমাজবিরোধী ব্যভিচার ঘটেছে। বাংলার বৌদ্ধ ও শাক্ত তান্ত্রিকদের উৎকট ও ভীষণ সাধনা ও বৈষ্ণবদের কলংক তার প্রমাণ। গোপন কায়াসাধন অভিনব দেহতত্ত্ব শূন্যধ্যান নারীসাধন ও শবোপাসনা ইত্যাদি পদ্ধতির মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সংগে মিলেছে ধর্মের তুরীয় ভংগী।

বৈচিত্র্য আর রূপান্তর! মানবপন্থী বাঙালী মন অধ্যাত্ম-জীবনের লক্ষ্যকে নানা রকম মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে সন্ধান করেছে—পিতা ও মাতা, পতি ও পত্নী, সখা ও সন্তানের রূপে। ভারতের আর কোনো প্রদেশে হিন্দু দেবদেবী এমন ঘরের মানুষ হতে পারেননি। আউল বাউল নাথ অবধূত কর্তাভজা বৈষ্ণব পাঁচুফকিরী খুসীবিশ্বাসী সহজিয়া প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মমত ও ধর্মসংঘের মধ্যে পাই বাঙালী ধর্মসংস্কৃতির রূপান্তর আর প্রাণবন্ত গতি।

আর্য ব্রাহ্মণ্যের যাগযজ্ঞনিষ্ঠা বাংলায় প্রচলিত থাকলেও বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবিরোধী ধর্মের সংগে বাঙালীর হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। তাই শাস্ত্রপন্থী ভারত বাঙালী হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু বলে মানতে অস্বীকার করে। বাংলার নিজস্ব ধর্মসাধনার গুরু শিক্ষিত শাস্ত্রীয় পণ্ডিত নন, 'প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষাহীন সহজ মানুষ।' প্রেম ও ভক্তির পথে তাই বাংলার ধর্মসাধনার গতি। শাক্ত শৈব বৌদ্ধ বৈষ্ণব সবের মধ্যেই রয়েছে প্রেমের আবেগ। কৃষ্ণভক্তি বাংলায় প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত, কিন্তু সেই ভক্তি রামানন্দ-

মাধব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক রীতির বাইরে। বাঙালী বৈষ্ণব মতের মূল সূত্র হচ্ছে নরলীলার মধ্যে প্রেমভক্তিজড়িত আত্মসমর্পণের নিবিড় অনুভূতি ; আর এই বৈষ্ণব মতের মধ্যেই রয়েছে বাউল পন্থার পূর্বাভাস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'— এই বৈষ্ণব সূত্রের মধ্যেই আছে বাউল মনের পূর্ণ পরিচয়। বৈষ্ণবেরা শাস্ত্র ও বিধি হতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্তি গ্রহণ করেননি, কিন্তু বাউল পন্থায় রয়েছে এই মুক্তির চরম ইংগিত। বাউলরা তাই বিধিনিষেধ বা জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ মানেন না ; এঁরা প্রাণবন্ত সহজ মানুষ :

তাই তো বাউল হৈনু, ভাই।
এখন বেদের ভেদবিভেদের
আর তো দাবিদাওয়া নাই।

গতাগতের বাঁধা পথে
আজায় না বাস কোনো মতে।

'নিত্য দ্বৈতে নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম'— এই হল বৈষ্ণব জীবনের মূল আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই প্রেমের পথে মানবতার জয়গানই হল বাউলের জীবন। বাউলী মানবধর্মের ধারা রূপ নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে :

রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে ?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে ?
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে—
দেবতা নাই ঘরে।

সমন্বয় ও রূপান্তর বাংলার নিজস্ব প্রতিভা। বর্ধমান বীরভূম বিক্রমপুর রাজশাহী চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় এক কালে বজ্রযান

দেবদেবীর পূজা সুপ্রচলিত ছিল; তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাধনকেন্দ্র ছিল কামাখ্যা আর শ্রীহট্ট। কিন্তু প্রেম ও ভক্তির রসে রূপান্তরিত হয়েছে বজ্রযান সহজযান ও একাভিপ্রায়ী পদ্ধতি। শাসকের ধর্ম হয়ে ইসলাম যখন এল বাংলায় তখনও বাঙালীর মন তাকে পরিপাক করে সমন্বয়-ধর্মের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে। গুরুবাদ ও স্তূপ-উপাসনা ইসলামের সংস্পর্শে এসে পীর ও গোর-পিরস্তির সংগে মিশেছে। সমন্বয়ের ফলে উদ্ভব হয়েছে সত্যপীর মাণিকপীর ও কালুগাজির মতো মিশ্রদেবতার। শীতলা রক্ষাকালী ও মনসা মুসলমানের পূজা পেয়েছেন আর মসজিদে মানত করেছে হিন্দু। বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিশে গেছে। বিজয়ী ইসলামের সামনে সনাতন ব্রাহ্মণ্য শুধু বিধিনিষেধের দ্বারা বাংলার কোমল মাটিতে তার সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না যদি চৈতন্যের মতো যুগাবতারের আবির্ভাব না হত। 'যবন হরিদাস চৈতন্যের নতুন সমাজের মানুষ।' এই সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল বলেই রামেশ্বর ভট্টাচার্য লিখলেন: 'অতঃপর বন্দিব রহিম রাম রূপ।' 'পীর বাতাসী'র মুসলমান গায়ন তাই মক্কা ও মদিনার সংগে কাশী ও গয়াকেও তাঁর তীর্থস্থান বলে বন্দনা করেছেন আর চট্টগ্রামের মুসলমান পল্লীকবি 'সীতা মা'কে প্রণাম জানিয়েছেন।

ইংরেজী আমলে যখন য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সংগে খৃষ্টধর্মপ্রচার আরম্ভ হল তখনও নতুন ভাবে খাঁটি হিন্দুত্বের সংগে খৃষ্টধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মে, রূপান্তর দেখা গেল প্রচলিত হিন্দুত্বের সংস্কারে ও সেবাধর্মের সৃষ্টিতে। রামমোহন ও কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সনাতন বাঙালীর মানবতার মধ্য দিয়েই ধর্ম-সংস্কৃতির পথ নির্দেশ করেছেন। মানবতার মধ্যে দৈব জীবনের উপলব্ধি করেই বাংলা ও ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী শ্রীঅরবিন্দ আজ বর্তমান ভারতের ধর্মগুরু।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই হচ্ছে বাঙালিত্বের ও বাঙালী সংস্কৃতির দৃঢ় বনিয়াদ। এই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাংলার নিজস্ব প্রতিভা ও আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়েছে ; তাই এ দুটি যত দিন জীবন্ত ও প্রগতিশীল থাকবে ততদিন শুধু সংস্কৃতি নয় সমগ্র বাঙালী জীবন ভরসা পাবে। বর্তমান ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই বাংলা সাহিত্য যার স্থান বিশ্বের দরবারেও স্বীকৃত হয়েছে। কিছুদিন আগে বিখ্যাত য়ুরোপীয় পণ্ডিত অধ্যাপক তুচি ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাংলা সাহিত্যের অতুলনীয় অবদানের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় সংস্কৃতি বুঝতে হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জানা একান্ত আবশ্যক। তিনি বলেন যে বাংলায় এমন বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে যেগুলির অনুবাদে সারা পৃথিবী উপকৃত হবে।

বাংলা লিপির পরিবর্তন যুগে যুগে হলেও অক্ষরের সাদৃশ্য অস্পষ্ট নয়। আর্যেরা বাংলায় আসবার আগে এখানকার অধিবাসীদের ভাষা কী রকম ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে সে ভাষার রূপ যে সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত পালি প্রাকৃত ও অপভ্রংশ—এই ধারার মধ্য দিয়ে বাংলার জন্ম হয়। এর প্রাচীনতম নিদর্শন যা পাওয়া যায় তা দশম শতাব্দীর আগের বলে মনে হয় না। এ যুগে শৌরসেনী অপভ্রংশও ব্যবহৃত হত। বোঝাই যায় কোনো একটি ভাষা এ যুগের সাহিত্যের মাধ্যম ছিল না। আঞ্চলিক ভাষা যে অনেক ছিল তার প্রমাণ মেলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাগত পার্থক্যে। অবশ্য সংস্কৃত থেকে বিচ্ছেদ কোনো যুগেই হয়নি।

আধুনিক বাংলা ভাষা গড়ে ওঠে দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি। এ ভাষার নিদর্শন মেলে ধর্মসম্বন্ধীয় নানা রকম সাহিত্যে। মুসলমান আমলে এ ভাষার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়, কিন্তু গদ্যের ভাষা

পরিণতি লাভ করেছিল আরো অনেক পরে, ইংরেজের যুগে। বিভিন্ন জাতির আগমনে, বিশেষত মুসলমানী প্রভাবে, বাংলা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতোই বৈদেশিক ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে — আরবী ফার্সি পোর্তুগীজ ইত্যাদি। হিন্দি ও উর্দু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা থেকেও শব্দ গৃহীত হয়। পরবর্তী যুগে ইংরেজী বাংলার সমৃদ্ধির একটি প্রধান উৎস হয়ে ওঠে। ইংরেজীর প্রভাব শুধু শব্দবৃদ্ধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না ; বর্তমানে বাংলা ভাষার গঠনরীতি ও ভংগীও প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই প্রভাব ইংরেজীশিক্ষিত লেখকদের মারফত ধীরে ধীরে ভাষার রূপান্তর আনছে। আর একটা কথা: স্বাধীনতার পরে উগ্র স্বদেশীয়ানার উৎপাতে অকারণ অসম্ভব ও অদ্ভুত পরিভাষার সৃষ্টি না করে আমাদের উচিত বৈদেশিক শব্দগুলিকে আত্মসাৎ করা, যেমন করেছে ইংরেজী ভাষা।

ভারতীয় সভ্যতার বাহন ছিল সংস্কৃত। সে ভাষা আজ অপ্রচলিত হলেও তার প্রভাব বাংলায় আজো জীবন্ত। নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি ও ভাষার ব্যঞ্জনায় সংস্কৃতের সাহায্য অপরিহার্য। কিন্তু এটা ঠিক যে বাংলা ভাষার একটা স্বতন্ত্র আত্মা বা প্রতিভা আছে। এর গতি ও ভংগী সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধিনিষেধ মানে না।

কাব্যের ভাষা মধ্য যুগে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও গদ্য ভাষার পরিপুষ্টি শুরু হয় ইংরেজী আমল থেকে, বিশেষ করে মিসনারি সাহেবদের চেষ্টায়। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা গদ্য ও কাব্যের ভাষা ছিল সংস্কৃতেরই অনুকরণ। এরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল এক দল লেখকের রচনায় ; এঁরা কথ্য ভাষা ও সংস্কৃতধর্মী লেখ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্যের অতিরিক্ত কৃত্রিমতা বর্জন করে 'চল্‌তি' ভাষার শুরু করেন। পরে অবশ্য একটা আপোষ হয় এবং সেই আপোষের ভাষা আজো চলেছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষত প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে, চলতি ভাষার দিকে মোড় ফিরেছে।

অবশ্য নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করবার সময়ে এখনো প্রধানত সংস্কৃতেরই সাহায্য নিতে হয়, কিন্তু ভাষার 'মেজাজ' যে বদলাচ্ছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তার সংগে আর একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ব্যাকরণ ও বানান সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্য ও পরিবর্তন। বাঙালীর প্রাণধর্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বোধ হয় তার প্রগতিশীল ভাষা ও সাহিত্য।

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজী আমলের আগে বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল ধর্ম। সাহিত্যের এই দীর্ঘ ধারা বিভিন্ন ধর্মমত আশ্রয় করে আধ্যাত্মিক জীবনকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সমাজ ও মানবিক প্রেরণা অবহেলিত হয়নি। সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যায়, তার আশা-ভরসা ও সুখ-দুঃখের পরিচয় মেলে। সমাজ-বিপ্লব সমাজের পরিবর্তন ও রীতিনীতি এ সবেরই পরিচয় পাই সাহিত্যে। ধর্ম সমাজ ও ব্যক্তি -- এই তিনের মিশ্রণ অল্পবিস্তর সর্বত্রই দেখা যায়। সাধারণত সাহিত্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়— (১) ধর্ম-সম্বন্ধীয়, (২) সমাজপ্রধান, (৩) ব্যক্তিগত। সাহিত্যকে আবার অন্য ভাবেও ভাগ করা যায় – (১) উচ্চতর সাহিত্য, (২) লোকসাহিত্য। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এ ধরণের ভাগাভাগি খানিকটা কৃত্রিম হবেই, তবে ধারাগুলো লক্ষ্য করবার পক্ষে এ রকম ভাগ অনেকটা সাহায্য করে।

দশম শতাব্দীর কাছাকাছি রচিত চর্যাপদগুলিকে প্রাচীনতম বাঙালী সাহিত্য বলে মেনে নিলে দেখা যায় যে এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে সহজিয়া বৌদ্ধমতের গূঢ় ব্যাখ্যা। অবশ্য অদীক্ষিত ব্যক্তির কাছে এর আধ্যাত্মিক অর্থ স্পষ্ট হয় না, তবে সংকেত সাহিত্য হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ :

চান্দ সূজ দুই চাকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছন্দা॥

(চাঁদ সূর্য দুই চাকা, সৃষ্টি সংহার মাস্তুল। বাম ডাহিনে দুই মার্গ বোধ হয় না, স্বচ্ছন্দে বেয়ে চল।)

যে ৪৭টি চর্যাপদ পাওয়া গেছে তার প্রত্যেকটিতে আছে চার থেকে ছয়টি পদ। জানা যায় যে এগুলির রচয়িতা ছিলেন বারোজন সিদ্ধগুরু। পরবর্তী যুগের নানা রকম ধর্মসাহিত্যের সূচনা হিসাবে এবং একটি লুপ্তপ্রায় ধর্মমতের রহস্যসন্ধানের দিক দিয়ে এগুলির মূল্য অসামান্য।

মধ্য যুগেই খাঁটি বাংলা সাহিত্যের শুরু হয়। এ যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে নানা রকম মংগলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য। মংগলকাব্যগুলি প্রধানত মনসা চণ্ডী ও ধর্মঠাকুরকে অবলম্বন করে রচিত। লৌকিক ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান হচ্ছে এদের উপাদান, কিন্তু সমসাময়িক সমাজের চিত্র এখানে বেশ নিপুণ ভাবেই আঁকা হয়েছে। এই রচনাগুলি গীতিধর্মী নয়, মূলত কাহিনীকাব্য। বিভিন্ন লোকের হাতের রচনা হলেও কয়েকটি চরিত্রের জীবনই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে— (১) মনসামংগল কাব্য (বিজয়গুপ্ত ও কেতকা দাস ইত্যাদির রচনা) : চাঁদ সদাগর লখিন্দর ও বেহুলা ; (২) চণ্ডীমংগল কাব্য (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও মুক্তারাম সেন প্রভৃতি) : কালকেতু ফুল্লরা শ্রীমন্ত খুল্লনা ইত্যাদি ; (৩) ধর্মমংগল কাব্য (রামাই পণ্ডিত মাণিক গাংগুলি ঘনরাম চক্রবর্তী ইত্যাদি) : রঞ্জাবতী ও তাঁর পুত্র লাউসেন ; (৪) অন্যান্য মংগলকাব্য— শীতলামংগল গংগামংগল চৈতন্যমংগল অন্নদামংগল (ইংরেজী আমলের সূচনায় ভারতচন্দ্রের লেখা) ইত্যাদি।

মধ্য যুগে বৈষ্ণবধর্ম আবির্ভূত হবার পর এই ধর্ম এবং শ্রীচৈতন্য ও তাঁর ভক্তদের জীবন নিয়ে এক বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। কাহিনী কীর্তন চরিতমালা পদাবলী ইত্যাদিতে এর সমৃদ্ধি বোঝা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে সমসাময়িক যুগের সমাজ-ও ধর্মবিপ্লবের

পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্মী রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মানবিকতা। ভক্তি প্রেম ও রসমাধুর্যের গুণে এই সাহিত্য অনুপম। এই সাহিত্যের সাধকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস জয়ানন্দ বৃন্দাবন দাস ইত্যাদি।

এ ছাড়াও নানা রকমের সাহিত্য ছিল। নাথসাহিত্যের নিদর্শন মেলে গোরক্ষবিজয় কাহিনী ও ময়নামতীর গানে। বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের মিশ্রণে নাথসম্প্রদায়ের যে মতবাদ গড়ে ওঠে তাকেই অবলম্বন করে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই এই সাহিত্য গড়ে তোলেন— যেমন ভবানী দাস ও শেখ ফয়জুল্লা। ছড়া ও প্রবাদবচন ইত্যাদির মধ্যে লোকসাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ; কিন্তু এ দুটি রচনায় মূল সংস্কৃত কাব্য থেকে যে পার্থক্য দেখা যায় তাতে বাঙালী মনের ছাপ স্পষ্ট রয়েছে। লোকসাহিত্যের উৎকর্ষের নিদর্শন বিভিন্ন অঞ্চলের পল্লীগাথা। এই সব কবিতা ও গানে পল্লীসমাজ, প্রকৃতির সংগে নিবিড় সম্পর্ক ও হৃদয়াবেগ অতি সরল ও মর্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকজন মুসলমান লেখকদের রচনায় মধ্য প্রাচ্যের গল্প স্থান পেয়েছে এবং তার ফলে রোম্যান্স্ আখ্যায়িকা ও উপন্যাসের সূচনা দেখা যায়। নাট্যরচনার ইতিহাসে যাত্রাগান পাঁচালি তর্জা ও কবিগান ইত্যাদির মূল্য অসাধারণ। কবিগানে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন দুজন— ভোলা ময়রা আর এক পোর্তুগীজ্ সাহেব 'অ্যাণ্টনি ফিরিংগি'।

আধুনিক যুগের সাহিত্য প্রেরণা পেয়েছে ইংরেজী সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও সাহিত্য থেকে। বাংলার নব জাগৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সাহিত্য আর আধুনিক যুগের প্রধান সৃষ্টি হচ্ছে গদ্য সাহিত্য। মধ্য যুগে গদ্যের অবস্থা শোচনীয় ছিল, কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত লেখকেরা মিসনারি সাহেবদের সহায়তায় ও

মুদ্রাযন্ত্রের মারফত সংবাদপত্র ও অন্যান্য গদ্যরচনার পথ খুললেন। সেই পথেই আজ বাংলার গদ্য অপরূপ সমৃদ্ধি লাভ করে এগিয়ে চলেছে।

আধুনিক যুগের প্রথম থেকেই একটা পরিবর্তন দেখা গেল—সাহিত্যে ধর্মের জায়গায় মানবজীবন ও সামাজিক চেতনার আবির্ভাব। এই খাতেই আধুনিক সাহিত্যের প্রগতি চলেছে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য পরিপাক করবার চেষ্টা করল একসংগে ইংরেজী রোম্যান্টিক্ ভাবধারা ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞান। তার ফলে গদ্যে ও কাব্যে এক বিস্ময়কর নব জাগরণ দেখা দিল। এই জাগৃতি মধ্য যুগের ধারাকে মূলত অস্বীকার করেই ঘটেছিল, যদিও লেখকদের মন ছিল ভারতীয় ও বাঙালী সংস্কৃতিতেই গড়া। ভাববিরোধ ও ভাবসমন্বয়ের মধ্য দিয়েই এই সাহিত্যিক জাগরণ সম্ভব হল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হল সাহিত্যিক যুগান্তর। গদ্যরচনার দিকেই নজর ছিল বেশি; রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় ধীরে ধীরে গদ্যরীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। এই সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় দেখি পুরানো কাব্যরীতির সংগে মিশেছে তৎকালীন সমাজচেতনা বিদ্রূপের ভংগীতে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই খাঁটি আধুনিক যুগের আরম্ভ হল—মধুসূদন ও বংকিমচন্দ্রের যুগ। গদ্যে পদ্যে ও নাটকে যুগান্তর এল এবং পাশ্চাত্ত্য ভাব ও রীতিকে পরিপাক করে সাহিত্যিকরা একটি বিরাট সংস্কৃতির সৃষ্টি করলেন। মধুসূদন ও বংকিমচন্দ্র ছাড়াও এ যুগে প্রতিভাবান লেখকের অভাব ছিল না—দীনবন্ধু রংগলাল বিহারীলাল হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র রমেশচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র ইত্যাদি। এ যুগের সাময়িক সাহিত্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেই সাহিত্যের এই বিরাট সাধনা হল অপরিমেয় ভবিষ্যতের দৃঢ় ভিত্তি।

বিশ শতকের প্রথম থেকেই শুরু হল রবীন্দ্র যুগ। অসংখ্য

লেখকদের সাধনায় সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে বিবিধ রচনা ও নতুন নতুন রীতির পরীক্ষার ফলে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। উনিশ শতক থেকেই মহিলাকবিদের রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ; বর্তমানেও লেখিকার সংখ্যা বহু। বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ। একটা জাতির রুচি সংস্কৃতি ও মানস চর্চার বিশিষ্ট ধারারই সৃষ্টি ও গঠন করেছেন তিনি। সাহিত্য সংগীত কলাশিল্প শিক্ষা জাতীয়তাবোধ সমাজচেতনা ভারতীয়তার পুনরুজ্জীবন আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সূচনা—সব দিক দিয়েই এমন মৌলিক ও বহুমুখী প্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় মেলে বলে মনে হয় না।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে অন্য একটি ধারার নির্দেশ রয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের খাতে চিরকাল চলা যায় না, চলা উচিতও নয়। তাই তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ করে ১৯৩০র পর থেকে নব সামাজিক চেতনা ও চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে আবার নতুন ধরণের বাংলা সাহিত্য। এ সাহিত্য সব সময়ে উচ্চ স্তরের না হলেও অগ্রগতির প্রেরণা ও বৈচিত্র্যে এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।

৬ : 'যদিও সন্ধ্যা'

বিংশ শতাব্দী থেকে ইংরেজ বাংলাকে 'সমস্যা-প্রদেশ' বলতে শুরু করেছিল। তার কারণ ইংরেজ যে শাসনপ্রণালী ভারতে চালিয়েছিল তার ফলে বাঙালীর জীবনই হয়ে উঠেছিল সব চেয়ে জটিল। নতুন ভাবধারা বাঙালীই গ্রহণ করেছিল সর্বপ্রথমে আর প্রতিক্রিয়াও তাই দেখা দিয়েছিল সবার আগে। অবশ্যম্ভাবী ও অমানুষিক নিপীড়ন ও অত্যাচার তাই এখানেই হয়েছে বেশি। সারা ভারতে ইংরেজী আমলের প্রথম দিকে বাঙালী প্রভুত্ব করেছিল; তারও প্রতিক্রিয়া আছে। তা ছাড়া প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সমস্যা তো ছিলই এবং আছেও। এই সব জড়িয়েই বাংলা হয়েছে 'সমস্যা প্রদেশ'—স্বাধীনতার আগে ও পরে।

মধ্য যুগের ঐতিহাসিক ধারা এগিয়ে চলেছিল স্বাভাবিক গতিতে রূপান্তরের পথে। বিদেশীর আকস্মিক প্রভুত্ব এমন সময়ে আনল বাধা ও বিপত্তি। যে সামাজিক বিপ্লব দেশীয় পরিস্থিতির মধ্যেই আসত তা এল বৈদেশিক শাসন ও শোষণের ভেতর দিয়ে। এই বিকৃতিই বাংলার সমস্যাবহুলতার প্রধান কারণ। আর বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও অসন্তোষ এবং সমাজব্যবস্থার দোষ স্বাধীনতার পরে হঠাৎ একসংগে দানবীয় আকার ধারণ করে আজ সারা ভারতের সমস্যা হয়ে উঠেছে।

এ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে ভারতের ভবিষ্যৎ আজো বাংলা ও বাঙালীর সমস্যার ওপরে অনেকখানিই নির্ভর করছে। একদা রাজাগোপালাচারি বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতের দেহকে অংগচ্ছেদের

দ্বারা সুস্থ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের জটিলতা যে এত সহজে সরল হয় না তারও প্রমাণ পাওয়া গেল যখন মাউণ্টব্যাটেন্-পরিকল্পনার আগেই মূলত অর্থনৈতিক নাড়ীর টানে বংগভংগের আন্দোলনে অবাঙালীর উন্মত্ত প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। কিছুদিন আগে সর্দার প্যাটেল্ স্বীকার করেছেন যে বাংলার কাছে সারা ভারত ঋণী আর বাঙালীর উন্নতি ও নেতৃত্ব ছাড়া ভারতের আশা নেই।

কিন্তু বংগবিভাগ যেমন হয়েছিল এক সমস্যা মেটাতে, বিভাগ আবার তেমনি জন্ম দিয়েছে হাজার সমস্যার আর এদের প্রায় প্রত্যেকটির সংগে সারা ভারতের ব্যাপক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। সমস্যা অবশ্য বিভক্ত পঞ্জাবেও আছে। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতের ভাগ হয়েছে তারই চরম পরিণতি দেখি পঞ্জাবে। তাই আজ আর সেখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নেই। কিন্তু সেই সমস্যা বাংলায় আজো রয়েছে ; পূর্ব বংগের হিন্দু ও পশ্চিম বংগের মুসলিম আজো পূর্ব ও পশ্চিমকে একেবারে আলাদা হতে দেয়নি। ফলে, সমস্যাও যেমন, আশাও তেমনি। তবে এটা ঠিক যে বৃটিশ শিকারী ভারত-বিহংগের পূবে ও পশ্চিমে দুটি পক্ষ ছেদ করে তার ওড়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে ; আর দুই ডানার দুটি টুকরো হয়েছে পাকিস্তান। এই পাকিস্তানের জন্মদাতা জিন্নাই অনেকদিন আগে বলেছিলেন যে ভারতত্যাগের সময়ে ইংরেজের চেষ্টা ও চিন্তা হবে : 'প্লাবন আসুক আমাদের পরে।' আর ইতিহাসের মর্মান্তিক বিদ্রূপ এই যে সেই প্লাবনের ধ্বংসে জিন্নাকেও অংশ নিতে হয়েছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ; নদী-বিপ্লব

পশ্চিম বংগই বাংলার প্রাচীনতম অংশ। এর চেয়ে উর্বর পূর্ব ও নিম্ন বংগ পলিমাটি থেকে জেগে উঠেছে অনেক পরে। পলিমাটির দেশ বলে এখানে নদী ও খালবিলের প্রাচুর্য। বাংলার জীবন রয়েছে

তার নদীতে আর তার নদীর 'ব'-প্রদেশ ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে উঠছে আর পড়ছে। জলের সংগে স্থলের বিপ্লব ও পরিবর্তন তাই বাঙালী জীবনের একটি প্রধান সমস্যা। এক সময়ে গংগানদীর মূল প্রবাহ মেদিনীপুর অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছিল; তাই হাজার বছর আগেও তাম্রলিপ্তি বা তমলুক ছিল পূর্ব ভারতের প্রধান বন্দর। মধ্য যুগের প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সরস্বতী নদীর নির্জীবতা ঘটাল সপ্তগ্রামের অপমৃত্যু। 'ব' প্রদেশের নদী পরিবর্তনশীল আর তাই সতেরো শতকে গংগানদী ভাগীরথীর প্রবাহ ছেড়ে চলল পূর্ব দিকে; ফলে, রূপনারায়ণ নিষ্প্রাণ হল আর জেগে উঠল জলাংগী মাথাভাঙা আর গড়াই। আঠারো শতকের শেষার্ধে দামোদর ত্যাগ করল ভাগীরথীকে; নদীবিপ্লবে প্রবল হল তিস্তা যমুনা ও কীর্তিনাশা। আজ ছ শো বছর ধরে গংগা নদী চলেছে পূর্ব দিকে বেয়ে—পুরানো বন্দর শহর আর গ্রাম হয়েছে প্রাণহীন, এসেছে ধ্বংস আর পরিবর্তন। মানুষও জংগল কেটে বসতি স্থাপন করে ডেকে এনেছে প্লাবন আর পলিমাটিকে, 'ব'-প্রদেশের নদীর সর্বনাশা প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলায় নদীবিপ্লবের দীর্ঘ ইতিহাসের পরিচয় মেলে মানচিত্রের তুলনায় - ভ্যান্ ডেন্ ব্রুক্ আর আইজ্যাক্ টিরিয়ানের মানচিত্র আর আধুনিক বাংলার ছবি।

যুগে যুগে ধ্বংস আর পরিবর্তন, অরণ্যের জাগরণ আর প্লাবনের সর্বনাশ, ম্যালেরিয়া-ব্যাধি আর জীবনীক্ষয়, কৃষ্টি-সংকট আর অর্থনৈতিক সমস্যায় বাঙালী জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ১৯৩০ সালে এক কমিটি স্থির করলেন যে প্রতিকারের আর কোনো উপায়ই নেই, মধ্য বংগ আবার জলাভূমি ও জংগলে পরিণত হবে। আবার একজন বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনীয়ার্ বলছেন যে গংগা নিজেই পুনরায় আশীর্বাদ করবেন: ভৈরব জলাংগী ও মাথাভাঙার পথে তাঁর আশীর্বাদের ধারায় আবার বাংলা বেঁচে উঠবে। পশ্চিম ও মধ্য বংগের নদীর

অধোগতিই পূর্ববংগের বন্যার প্রধান কারণ। পদ্মার বিপুল জলস্রোত ও মেঘনার গতি রোধ করে প্রবাহকে ঘুরিয়ে না দিলে পূর্ব ও পশ্চিমে ধ্বংসের হাহাকার উঠবে। নোয়াখালি ডুবেছে।

কিন্তু অ্যামেরিকা ও রাশিয়ায় মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 'ব'-প্রদেশের নদীর ধ্বংসলীলা রোধ করেছে, জলনিয়ন্ত্রণ ও বাঁধের দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। বাংলার বিপুল জলসম্পদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হলে ম্যালেরিয়া তো দূর হবেই ; তা ছাড়া কৃষির উন্নতি আর জলবৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটবে। আজ বাংলার এই উন্নতি বা অবনতির সমস্যা পূর্বে ও পশ্চিমে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। দীর্ঘ কাল ধরে পশ্চিমের অবনতি পূর্বের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে নানা কারণে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যুক্ত প্রচেষ্টায় উভয়েরই উন্নতির সম্ভাবনা। নদীমাতৃক বাংলা দেশকে কৃত্রিম উপায়ে দুটি বিরোধী রাষ্ট্রে ভাগ করা যায় না। প্রাকৃতিক কারণে দু পক্ষকেই পরস্পর নির্ভর করতে হবে। শুধু দামোদর-পরিকল্পনায় সমস্যার সমাধান হবে না। পূর্ব বংগেরও গুরু দায়িত্ব রয়েছে।

সীমানা

ইংরেজী আমলে ১৭৬৫ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা এক সংগে ছিল; ১৮২৬ সালে এদের সংগে জুড়ে গেল আসাম, আবার আলাদা হল ১৮৭৪ সালে। এই চারটি প্রদেশের পরস্পর সম্পর্ক প্রাক্-ইংরেজ যুগেও ছিল ; এদের অর্থনৈতিক ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গভীর। এই প্রদেশগুলির সীমানা কিন্তু আজো কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়নি। ইংরেজের রাজত্বে সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে নানা কারণে, বিশেষত বিভেদনীতির তাগিদে।

বাংলার নানা অঞ্চল নানা ভাবে বিহার ও আসামের সংগে যুক্ত করা হয়েছে বাঙালীর দ্রুতবর্ধমান শক্তিকে খর্ব করবার জন্য ও প্রাদেশিকতার মধ্য দিয়ে ভাঙনের বীজ বপন করবার উদ্দেশ্যে।

আসাম যখন বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হল তখন সে নিয়ে গেল কাছাড় ও শ্রীহট্ট। কিন্তু কাছাড়ের ছয় লক্ষ লোকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ ও খাঁটি আসামীর সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। শ্রীহট্টের ২৮ লক্ষ লোকের মধ্যে বাঙালীরা সংখ্যায় ২৬ লক্ষ আর আসামীর সংখ্যা ২ হাজার। আসাম-উপত্যকাতেও, বিশেষত গোয়ালপাড়া ও নওগাঁতে, বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা প্রবল। সমস্ত আসাম প্রদেশেই আসামীভাষাভাষীদের সংখ্যা বাংলাভাষীদের অর্ধেক। অবশ্য বর্তমানে শ্রীহট্টের অনেকটাই পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। শ্রীহট্টের অবশিষ্ট অংশ কাছাড় ত্রিপুরা ও মণিপুর নিয়ে পূর্বাচল প্রদেশ (প্রায় ১৫,০০০ বর্গমাইল) অনায়াসেই গঠন করা যেত, কিন্তু তা হয়নি কংগ্রেস সরকারের আপত্তিতে।

১৯১২ সালে বাংলার কয়েকটি অঞ্চল বিহারে চলে যায় অনেক আপত্তি সত্ত্বেও। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের ২৯০ ধারায় আবার যুক্ত করবার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু তখন কোনো চেষ্টা হয়নি নানা কারণে। মানভূম জেলা ও সিংভূম জেলার ধলভূম অঞ্চলেই বাংলার দাবি সব চেয়ে বেশি—মোট ৫,৩০০ বর্গমাইল জায়গায়। মানভূমের লোকসংখ্যা সাড়ে কুড়ি লক্ষ: তার মধ্যে বাঙালী সাড়ে বারো লক্ষ, হিন্দীভাষী সাড়ে তিন লক্ষ, বাকি আদিবাসী। ধলভূমে বাঙালী শতকরা ৫৭ জন; জামসেদপুর বাদ দিলে, শতকরা ৬২ জন। পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ অঞ্চলে গ্রিয়ার্সন্ সাহেবের মতের ভিত্তিতে বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা হয় শতকরা ৯৭ জন; কিন্তু এই অঞ্চলের ওপরে বাংলার দাবি দুর্বল করবার জন্য বৃটিশ সরকারের আদেশে ১৯২১র লোকসংখ্যাগণনায় কিষণগঞ্জিয়া ভাষাকে হিন্দি ভাষা

হিসাবেই ধরা হয় এবং তার ফলে বাংলাভাষাভাষীদের সংখ্যা কমে ৬ লক্ষ। এ ছাড়া সাঁওতাল পরগণার কয়েকটি অঞ্চলেও বাংলা ভাষার প্রতিপত্তি রয়েছে। পূর্ব বিহারের আদিবাসীদের সংগে বাঙালীদের সম্পর্ক বিহারীদের চেয়ে বেশি, বাংলা ভাষার প্রচলনও। তা ছাড়া সমাজবিন্যাস আচার প্রথা সংস্কৃতি ইত্যাদি ব্যাপারেও আসাম ও বিহারের অঞ্চলগুলি বাংলায় যুক্ত হবার দাবি রাখে। শেরাইকেল্লা খরসোয়ান ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজ্যগুলির কয়েকটি অংশও বাংলায় যুক্ত হতে পারত। কিন্তু সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ানকে উড়িষ্যার সংগে যোগ করেও কংগ্রেস সরকার পরে দুটিকে অযৌক্তিক ভাবে বিহারের সংগে জুড়ে দিয়েছেন। অতঃ কিম্!

অথচ একাধিক বার কংগ্রেস বলেছেন যে ভাষার ভিত্তিতেই প্রদেশের সৃষ্টি বা প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ হবে। তা ছাড়া অনেক দিন থেকেই বিহার ও আসামে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে বাঙালীরা সুবিচার পাচ্ছে না। তাদের দাবি দুর্বল করবার জন্য হিন্দি ও আসামী ভাষার প্রচারকার্য প্রাদেশিক সরকার নির্বিচারে চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষত বিহার সরকার আন্দোলন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে নানা রকম অবিচার ও অত্যাচারও করেছেন। অন্ধ্র মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশগঠনের তোড়জোড় চলেছে কিন্তু বাংলার দাবি সম্বন্ধেই কংগ্রেসী নেতাদের যত ঔদাসীন্য ও বিরোধিতা। খনিজ সম্পদের অঞ্চলগুলি নিয়ে একটি পৃথক শিল্পকেন্দ্রীয় প্রদেশ গঠন করবার প্রস্তাব হয়েছে এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটি হচ্ছে ধনপতিদের স্বার্থরক্ষার চক্রান্ত; এতে বাংলা ও বিহারের জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 'বিহার-বংগ' নামে একটি যুক্ত প্রদেশ গঠন করার কথাও উঠেছে। কিন্তু এ সমস্ত প্রস্তাবই আসল সমস্যাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল-দাবি অনস্বীকার্য। পূর্ব বংগ থেকে আশ্রয়প্রার্থী হিন্দুরা দলে দলে আসতে শুরু করেছে। ক্ষুদ্র পশ্চিম বংগে বর্তমান লোকসংখ্যার

উপযোগী স্থান ও সম্পদ নেই। অবশ্যম্ভাবী অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তাই শুধু বাংলা নয় সারা ভারতের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে। নানা কারণে বাংলায় কংগ্রেসী প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে ; এর জন্য কংগ্রেসী নীতি ও কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই খানিকটা দায়ী। বাঙালীর মনে তাই এই ধারণা দৃঢ় হয়ে উঠছে যে ঈর্ষা ও প্রাদেশিকতা ছাড়াও অন্য কারণ আছে : বাংলার কংগ্রেসবিরোধিতার জন্যই তার আঞ্চলিক দাবিকে অবহেলা করা হচ্ছে।

বাংলায় যে দুটি দেশীয় রাজ্য রয়েছে তাদের স্বতন্ত্র সত্তার আর কোনো অর্থই হয় না। কুচবিহার (১৩১৮ বর্গ মাইল) ও ত্রিপুরা (৪১১৬ বর্গ মাইল)—এ দুটিরই বাংলার সংগে মিশে যাওয়া উচিত। বর্তমানে ত্রিপুরার সংগে পশ্চিম বংগের যোগ নেই ; পূর্বাচল প্রদেশ হলে এ সমস্যার সমাধান হত এবং পাকিস্তান সীমানার হাংগামাও কমত। কুচবিহার একটি জেলা হিসাবে সহজেই বাংলার সংগে যুক্ত হতে পারে ; কিন্তু কথা উঠেছে কুচবিহারকে আসামের সংগে যুক্ত করবার।

এর পরেই প্রশ্ন ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে। ২৫০০ বর্গমাইলের এই দ্বীপপুঞ্জ বাংলার সংগে যুক্ত হতে পারে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনে। এখানকার অরণ্যভূমি এতদিন বন্দীদের আবাস হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে বাংলার উদ্বাস্তু জনগণের বসতি হতে পারে। এর বন্দর এবং কৃষিজ দ্রব্য ও অরণ্যসম্পদ বাঙালী ঔপনিবেশিকদের পক্ষে মূল্যবান হবে। বাঙালীর ঔপনিবেশিক বসতি আন্দামানে আরম্ভ হয়েছে।

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'

১৯০৫র বংগবিভাগ এনেছিল জাতীয়তাবোধ ও সারা ভারতের রাজনৈতিক চেতনা ; ১৯৪৭র বংগবিভাগ আনল জাতীয়তার অপমৃত্যু

ও সারা ভারতের ভবিষ্যৎ অবনতির সম্ভাবনা। ১৯০৫র বংগবিভাগের মূলে একটা ভৌগোলিক ভিত্তি ছিল; ১৯৪৭র বংগবিভাগের মূলে রয়েছে মারাত্মক সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৭র ১৫ই অগাস্টর কয়েকদিন পরেই র‍্যাড্‌ক্লিফের আজব বিবরণী বেরোল। যারা একদিন বংগভংগ রোধ করতে গিয়ে সারা ভারতের জাতীয় চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল তারাই চাইল বাংলাভাগ—ইতিহাসের উপহাস! 'স্বাধীন বংগ' আন্দোলনে কেউ কর্ণপাত করেনি। কিন্তু র‍্যাড্‌ক্লিফের দুই বাংলা সত্যিই অপরূপ সৃষ্টি! যে কোনো স্কুলের ছাত্রও এমন একটা অযৌক্তিক ব্যাপার করতে পারত না। তা হলে র‍্যাড্‌ক্লিফ্ করলেন কেন? যুক্তি করেই, যুক্তিটা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীর। দুটি বাংলাকেই দুর্বল অচল সমস্যাজর্জর করে দেওয়া চাই, আর তার সংগে ভারত ও পাকিস্তানকেও।

১৯০৫র দুটি বাংলার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক সীমানা ছিল; র‍্যাড্‌ক্লিফ্ দুটি রাষ্ট্রের মাঝে কোন সীমানা রাখলেন না—বিবাদ বাধাবার জন্য। তিনি হিন্দুপ্রধান খুলনাকে দিলেন পাকিস্তানে আর মুসলিমপ্রধান মুর্শিদাবাদকে টানলেন পশ্চিম বংগে, যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা না মেটে। পশ্চিম বংগের উত্তর ও দক্ষিণে কোনো সম্পর্ক রইল না, যাতে পরে বাঙালী ও অবাঙালীর মধ্যে বিরোধের সুবিধা হয়। পনেরোই অগস্ট্ খুলনা আর মুর্শিদাবাদ পতাকা তুলল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, তার পরে ঘটল পতাকাবিভ্রাট। সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে র‍্যাড্‌ক্লিফ্ জলপাইগুড়ি থেকে একটু দিলেন পূর্ব বংগে আর যশোর থেকে কাটলেন পশ্চিম বংগে। দিনাজপুরের খানিকটা, নদীয়ার খানিকটা আর গোটা মালদহটাই দিয়ে ফেললেন পশ্চিম বংগকে আর এই অবিচারের ক্ষতিপূরণ করতে গিয়ে মুসলমানহীন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঠেলে দিলেন পূর্ব বংগে। বিভাগের ব্যবস্থা করে দেশে গিয়ে র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কলকাতায় ইংরেজের স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলেন।

তাঁর ব্যবস্থায় কেউ খুসী হল না ; বোঝা গেল তা হলে সুবিচার হয়েছে !

সুবিচারের ফলে পূর্ব বংগের আয়তন হল পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল, পশ্চিম বংগের হল আটাশ হাজারের কিছু বেশি। পূর্ব বংগে ১৯৪১র লোকসংখ্যা ছিল প্রায় চার কোটি আর পশ্চিম বংগে প্রায় সওয়া দুই কোটি। সংখ্যাবৃদ্ধি তো হয়েছেই, উপরন্তু স্থানান্তরের ফলে সংখ্যা নির্দেশ করা কঠিন। পূর্ব বংগে হিন্দুরা সংখ্যায় তুচ্ছ নয়, পশ্চিম বংগে মুসলমানরাও নয়। তা হলে বিভাগে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হল কোথায় ? পূর্ববংগ কৃষিপ্রধান ; পশ্চিমবংগ শিল্পপ্রধান। পূর্ববংগে গেল পাট, অনেকটা ধান, খানিকটা চা ; পশ্চিমবংগে রইল সমস্ত খনিজ সম্পদ, প্রায় সমস্ত কলকারখানা ও মিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের পূর্ণ ব্যবস্থা, শাসনযন্ত্রের কাঠামো আর মহানগরী কলকাতা। পূর্ব বংগের তিন দিক ঘিরে রইল ভারতীয় সীমানা, খোলা রইল জলপথ। পূব বংগকে বাঁচতে হলে গড়ে তুলতে হবে সব কিছু, পশ্চিম বংগকে অনেক কিছু।

বাংলা বিভক্ত হওয়ার পর অবিভক্ত বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে এক বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। পূর্ব বংগে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। এই দৃষ্টিকটু সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের কারণ যাই হোক এর ফলে হয়েছে শ্রেণীবিরোধ। পাকিস্তানপ্রতিষ্ঠার পরেই মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুকে উৎখাত করে সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা আনবার একটা তীব্র প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। পূর্ববংগবাসী পাকিস্তানী মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা শ্রেণীবিরোধকে মর্মান্তিক করে তুলছে। ভারতীয় নেতাদের ও সাংবাদিকদের অসংযত মন্তব্যও এর মূলে রয়েছে। বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত হবার পর থেকেই হিন্দুরা চলে আসছে এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি খাদ্য ও জীবিকার

ব্যবস্থা করা ক্ষীণশক্তি ও ক্ষুদ্র পশ্চিম বংগের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

পশ্চিম বংগের মুসলমান সংখ্যায় অল্প এবং হিন্দুর চেয়ে সব বিষয়েই অবনত। ফলে, হিন্দুর ঈর্ষা ও মুসলমানের সামর্থ্য—এ দুয়েরই অভাব। সাম্প্রদায়িকতা তাই পশ্চিমে কম ও পশ্চিমবংগবাসী মুসলমান কমই গেছে পূর্ব দিকে—গেছে ভয়ে নয়, জীবিকালাভের সুবিধার জন্য এবং অনেকে ফিরেও এসেছে নবগঠিত রাষ্ট্রের অসুবিধা ও অব্যবস্থার তাড়নায়। তা হলে দেখা গেল যে পশ্চিমে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক প্রায় আগের মতোই রয়েছে, সমস্যা হয়েছে পূর্ববংগবাসী আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে। আসল সমস্যা কিন্তু পূর্ব বংগেই কারণ শ্রেণীসংঘর্ষ উত্থানপতন ও দেশত্যাগ ঘটেছে সেখানেই। পূব ও পশ্চিমের পারস্পরিক সমস্যাই প্রমাণ করে বিভাগের কৃত্রিমতা। তাই পুনর্বসতির সাময়িক ব্যবস্থা করলেও আসল সমাধান আসবে সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তনে—যার ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা। স্থানান্তরের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম দুই-ই বিপন্ন হবে একাধিক কারণে। দ্রুতবর্ধমান লোকসংখ্যার বসতি ও জীবিকার জন্যও স্থান ও সম্পদের অভাব হবে। অবিভক্ত বাংলা ছিল আয়তনে ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে পঞ্চম কিন্তু লোকসংখ্যায় প্রথম। এখন থেকে ঘন বসতির বিবিধ সমস্যার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা না করলে শুধু বাংলা নয় সারা ভারতই বিপন্ন হবে। বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের ওপরে দাবি তাই এ দিক দিয়েও যুক্তিসংগত।

বাংলার মৌলিক সমস্যাগুলি আরো জটিল হয়ে উঠেছে বিভাগের ফলে। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে পূর্ব বংগে সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী মুসলিম লীগ্ সর্বাধিপত্য করছে; প্রগতিশীল কোনো দল এখনো গঠিত হতে পারেনি। তবে তার যে সূচনা হচ্ছে তা বোঝা যায় নানা রকম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের

মধ্যে। পূর্ব বংগে পশ্চিম পাকিস্তানী নীতির প্রভাব 'বাঙালী' সমস্যাকে বর্তমানে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিক্ষোভ যত বাড়বে 'বাঙালী' সমস্যা তত বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে আর লীগ-বিরোধী দলও ধীরে ধীরে গঠিত হবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানও পূর্ব বংগে আছে – এ কথা ভুললে চলবে না।

পশ্চিম বংগে বামপন্থী দলের অভাব নেই, আবার সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভাও আছে। নানা রকম সমস্যা ও দুর্নীতির ফলে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবও এখানে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। এর প্রভাব বাংলার ও ভারতের রাজনীতিতে অদূর ভবিষ্যতে স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাবে। পূর্ব বংগ ও পশ্চিম বংগের গণচেতনার অসমতার একটি মূল কারণ হচ্ছে পূর্ব বংগে কলকাতার মতো মহানগরীর অভাব; ঢাকা এ অভাব পূরণ করতে পারে না। পূর্ব বংগে শ্রমশিল্পের অভাব, আর তাই আন্দোলন হবে ভবিষ্যতে চাষীদের মধ্যে। পশ্চিম বংগে ঘন বসতির ফলে চাষীদের ওপরে চাপ বেড়ে যাবে, মজুর অসন্তোষের তো অভাব নেই। সুতরাং এখানে চাষী-মজুরের যুক্ত আন্দোলন চলবে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য। পূর্ব বংগে রাষ্ট্রগঠনের পর ক্রতবর্ধমান মুসলমান মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক সংকটের দিনে শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে না, আর তা ছাড়া তাদের মধ্যে অনেকেরই মধ্যবিত্ত-ঐতিহ্য নেই। পূর্ব বংগে সেইজন্য শ্রেণীবিরোধ বিশেষ প্রখর হতে পারবে না। পশ্চিম বংগের মধ্যবিত্ত উন্নততর ও দৃঢ়তর। কিন্তু ১৯৩৯র পর থেকে নানা কারণে বিশেষত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে এখানকার নিম্ন মধ্যবিত্ত এমন বিপন্ন হয়েছে যে নিম্ন শ্রেণীর সংগে তার পার্থক্য দিন দিন কমে আসছে। তা ছাড়া মধ্যবিত্তের মধ্যে বামপন্থী অসন্তোষ ধীরে ধীরে সাম্যবাদের আকার নিচ্ছে। এই সব ব্যাপারের মধ্য দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে যে ঐতিহাসিক শক্তি পুঞ্জীভূত হবে তার আঘাতে আগামী

যুগে বিপ্লবী পরিবর্তন হতে বাধ্য। র‍্যাড্‌ক্লিফের কৃত্রিম বিভাগের ভুল হয়তো এইখানেই ধরা পড়বে; দু পক্ষের অসুবিধার ভেতর দিয়েই হয়তো জাগ্রত হবে শুভ সমাজবুদ্ধি ও রাজনৈতিক কল্যাণ।

দূষিত ক্ষতের মতো বিভক্ত পঞ্জাব ও বিভক্ত বাংলা শুধু নিজেরাই জর্জর হবে না, সারা ভারত ও পাকিস্তানকেও বিপন্ন করে তুলবে — বিশেষত বাংলা। ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলারই ছিল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবার মতো কয়েকটি লক্ষণ। যে প্রশ্ন পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকেরই মনে আছে তা হচ্ছে : ভবিষ্যতেও কি বাংলা বিভক্ত থাকবে? অনেক রাষ্ট্রীয় বিভাগই তো ইতিহাসে স্থায়ী হতে পারেনি। প্রথম কথা: ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের ওপরে অখণ্ড বাংলার সম্ভাবনা নির্ভর করছে। দ্বিতীয় কথা: খণ্ডিত ভারতের চেয়ে খণ্ডিত বাংলা অনেক বেশি কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। তৃতীয়ত: সাম্প্রদায়িক অসাম্য ও অবিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক শাসনরীতি স্থায়ী হলে পুনর্মিলন অসম্ভব। চতুর্থ কথা: ভবিষ্যতে নানা কারণে পুঞ্জীভূত শক্তির ফলে এমন এক যুগান্তরী সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা যার আঘাতে সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত অবিশ্বাস সন্দেহ ও বিরোধ সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। এখানেই বাংলার মানবধর্মের চরম পরীক্ষা। কিন্তু সবার চেয়ে বড় কথা: দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়েও পূর্ব ও পশ্চিম বংগের বর্তমানে অবিরোধী অবস্থান। তার লক্ষণ স্পষ্ট এবং এখানেই বাঙালীর অখণ্ডতার প্রমাণ।

হিন্দু-মুসলমান

আজ প্রায় আট শো বছর ধরে বাংলায় মুসলমানরা বাস করছে। ১৮৮১র লোকসংখ্যাগণনায় তারা হিন্দুকে প্রথম ছাড়িয়ে গেল; তার দশ বছর আগেও হিন্দু ছিল ১৮১ লক্ষ আর মুসলমান

ছিল ১৭৬ লক্ষ। ১৯৪১র গণনায় দেখা গেল হিন্দু আড়াই কোটির কিছু বেশি আর মুসলমান সাড়ে তিন কোটির কিছু কম। ৬০ বছরে হল এই বিরাট সংখ্যাবৈষম্য এবং এর ফলে যে সমগ্র জাতীয় জীবনে পরিবর্তন আসবে তা তো বোঝাই যায় সহজে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা উচিত : সংখ্যার হার মুসলমানের বাড়ছে কিন্তু হিন্দুর কমছে। এরই জন্য প্রশ্ন উঠেছে : 'বাঙালী হিন্দু কি ক্ষয়িষ্ণু ?' সাম্প্রদায়িক তুলনায় এই সংখ্যাহ্রাস দৃষ্টিকটু হতে পারে কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাহার এমন কিছু নয় যে তার জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তা করতে হবে; শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই কর্তব্য শেষ হয় না। অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধিরও হাজার রকমের সমস্যা আছে। মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে — বহুবিবাহের রীতি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে, বিধবাবিবাহের প্রথা, বাল্যবিবাহ, দায়িত্বজ্ঞানহীন অতিপ্রজনন, নিম্নবর্ণ কর্মঠ হিন্দুর মতো প্রজনন শক্তির প্রাচুর্য। হিন্দুর সংখ্যা-হ্রাসের কারণ হচ্ছে — উচ্চবর্ণ হিন্দুর মধ্যে জীবনীশক্তির অভাব ও জন্মনিরোধ রীতি, উচ্চবর্ণের পরিণত বয়সে বিবাহ ও বিবাহে অনিচ্ছা বা অর্থনৈতিক অসামর্থ্য, বিধবাবিবাহের ও বহুবিবাহের অভাব, অতিরিক্ত জাতিভেদ ও শ্রেণীবিভাগের ফলে জীবনীশক্তির দুর্বলতা ও বিবাহের স্বল্পতা এবং পণপ্রথা।

যাই হোক, বর্তমানে সংখ্যাবৈষম্য অনেক সমস্যাই জাগিয়ে তুলেছে। প্রথমেই নজরে পড়ে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য। এর সংগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিচার করলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিরোধের সম্ভাবনা সহজেই বোঝা যায়। কুচক্রী ও অনুদার লোকেরা (ইংরেজ হিন্দু ও মুসলমান) তাই রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবিরোধী আন্দোলন চালাতে সুবিধা পেয়েছে ও পাবে। হিন্দুর অনুদার সমাজপ্রথা এবং মুসলমানের গোঁড়ামি অশিক্ষা ও দারিদ্র্য এই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবল করে

তুলেছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা না থাকলে বাংলা যে শুধু সব দিক দিয়ে ভারতের উন্নততম প্রদেশ হত তা নয়, হয়তো সমস্ত ভারতেরই ইতিহাস বদলে যেত।

আয়তনের তুলনায় দ্রুতবর্ধমান লোকসংখ্যা বাংলাকে বেশ বিপন্ন করেছে। বাসস্থান খাদ্য জীবিকা ও উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অভাবে এই বিরাট জনতা দারিদ্র্যে ও বিরোধে, অন্নাভাবে ও আত্মকলহে অমানুষ হয়ে ভারতে ও পাকিস্তানে ভীষণ বিপদের সৃষ্টি করবে। 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'র আর বৃদ্ধিতে প্রয়োজন নেই, 'বর্ধিষ্ণু মুসলমান'কেও সংখ্যাহার কমাতে হবে। কুচক্রী ও কুশিক্ষিত লোকের পরামর্শে যদি এরা সংখ্যাবৃদ্ধিব্রতে মনপ্রাণ নিবেদন করে তা হলে দু পক্ষেরই সমূহ সর্বনাশ।

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে দেখতে হবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সংযত ভাবে :

> ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক না করলে ধর্ম আর ধর্মই থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়..... আনুষ্ঠানিক ধর্মের দৃষ্টি স্বভাবতই অতীতের দিকে; পক্ষান্তরে, বর্তমান যুগের বিশ্বমানবের দৃষ্টি হল ভবিষ্যতের দিকে।..... অনুষ্ঠানমূলক সামাজিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূষিত করার অর্থ হচ্ছে প্রগতির সর্ববিধ পথকে অর্গলবদ্ধ করা।...... আনুষ্ঠানিক ধর্মের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এই যে তার প্রকৃতি হল মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা, মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত করা এবং সেই গণ্ডীগুলিকে ধর্মের আকার দিয়ে চিরস্থায়ী করে তোলা। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্মই এই পথে গিয়েছে... . ইউরোপ ভূখণ্ডে ধর্মরাষ্ট্রের অবসান ঘটেছে আর প্রাচ্যের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিও দ্রুত সেই একই পথে অগ্রসর হচ্ছে।
>
> — ওয়াজেদ আলি : 'ভবিষ্যতের বাঙালী'

এই কয়টি কথা মনে রাখলেই বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিগত

ধর্মমত বজায় রেখেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হিন্দুত্ব বা ইসলাম বর্জন করে খাঁটি বাঙালী হবে।

কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিশেষ কারণগুলি কী ?

(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য দুই সম্প্রদায়ে ; (২) শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার দোষ ; (৩) ধর্মগুরুদের সাম্প্রদায়িক প্রভাব ; (৪) শ্রেণীবিরোধের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ; (৫) দুই সম্প্রদায়ের ধনী ও মধ্যবিত্তদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও তার প্রভাব রাজনৈতিক জীবনে ; (৬) সামাজিক ভেদাভেদ ও যৌথ জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব ; (৭) ইংরেজের বিভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িক অবাঙালীদের অবাঞ্ছিত প্রভাব ; (৮) অতীতের সাম্প্রদায়িক গৌরবের স্বপ্ন ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কল্পনা। কিন্তু এ কথা ঠিক যে এত বিদ্বেষ ও বিরোধিতা সত্ত্বেও 'স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে আর ভাবীকালেও থাকবে (ওয়াজেদ আলি)।'

কিন্তু এখন উপায় কী ? প্রথমেই অর্থনৈতিক বিরোধ দূর করার জন্য সর্ব রকমের প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষা ও প্রচারকার্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা সুস্থ গণচেতনার সৃষ্টি করতে হবে। 'এ কাজ হিন্দুদের মধ্যে কতকটা অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মোটেই হয়নি। তাই মুসলমানদের মধ্যে হাতুড়ে রাজনীতিকদের প্রভাব এতো বেশি। মুসলমানের শিক্ষার দৈন্য এবং রাজনৈতিক চেতনার অভাব আজ সমস্ত দেশকে বিপন্ন করে তুলেছে (ওয়াজেদ আলি)।' সংস্কারমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিশেষ প্রয়োজন, কারণ অশিক্ষা ও কুশিক্ষা সত্ত্বেও বাঙালীর কাছে সংস্কৃতির একটা স্বাভাবিক আবেদন আছে যা অন্য ভারতীয়দের কাছে এতটা নয়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-অনুষ্ঠানগুলির মূল্য কমিয়ে যৌথ জাতীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ধারা গড়ে তুলতে

হবে। সম্পূর্ণ ভাবে দূর করতে হবে সামাজিক ভেদাভেদ—এ দিকে হিন্দুরই দায়িত্ব বেশি। নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই বাংলার লোককে হিন্দু-মুসলমানত্ব ছেড়ে বাঙালী হতে হবে। জাতীয়তার গুরু দায়িত্ব রয়েছে বাঙালীর ওপরে। শোনা যায় গান্ধীজী নাকি তাঁর শেষ-জীবনে বাঙালীর এই মহৎ দায়িত্বের কথা বার বার বলেছিলেন। এই মিলনের গুরুত্ব প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝেছেন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন :

> পল্লীসমাজে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে অন্তর্বিবাহ যদি ধর্মান্তর-গ্রহণ সাপেক্ষ না হয় তাহা হইলে ইহা সামাজিক শান্তি ও সদ্ভাবের পরিপোষক হয়।...বিবাহ অসম্ভব হইয়াছে শুধু সামাজিক অনুশাসনের জন্য।
>
> —'বিশাল বাংলা'

বাঙালী জীবনের এই মর্মান্তিক সাম্প্রদায়িক সমস্যা অবাঙালীর পক্ষে বোঝা নানা কারণে সম্ভব নয়। তাই বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে অবাঙালী হিন্দু বা মুসলমানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা বাঙালীর পক্ষে কোনো মতেই উচিত নয়। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে যৌথ জাতীয়তা ও সামাজিক উদারতার পথে এগিয়েছিল বলেই বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে অবাঙালীরা খাঁটি হিন্দু বা মুসলমান বলে অনেক সময়েই মনে করে না। বাঙালী মুসলমানের পক্ষে অবাঙালী মুসলমানের অন্যায় আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন, কারণ তার শিক্ষা ও অর্থবল নেই। তাই হিন্দুর দায়িত্ব বেশি।

অন্যান্য সম্প্রদায়

প্রায় ৭০ লক্ষ বাঙালী 'প্রবাসী' হিসাবে বাংলার বাইরে বাস করে—৫০ লক্ষ বাংলার বাইরে বাংলাভাষী অঞ্চলে ও বাকি ২০ লক্ষ অন্যান্য জায়গায়। বাংলায় বাস করে অবাঙালী 'পরদেশী'

প্রায় ২০ লক্ষ প্রধানত শ্রমিক ও ব্যবসায়ীর বৃত্তিতে। এদের মধ্যে বিহারী ও ওড়িয়াই সংখ্যায় বেশি। কলকাতা ও অন্যান্য নগরে, শিল্পকেন্দ্রে ও চা-বাগানেই এদের বাস। শ্রমিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে অবাঙালীর আধিপত্য খুবই বেশি। কলকাতা ও হাওড়ার জনসংখ্যার যথাক্রমে শতকরা ২০ ও ৩০ জন অবাঙালী। পূর্ব বংগের চেয়ে পশ্চিম বংগেই এদের বসতি অনেক বেশি। বর্তমানে অবশ্য ওপরের সবগুলি সংখ্যাতেই পরিবর্তন হয়েছে।

বাঙালী কৃশ্চান্ ও বৌদ্ধের সংখ্যাও কম নয়। এদের মধ্যে নিজস্ব সামাজিক সমস্যা থাকলেও বৃহত্তর জাতীয় জীবনের উন্নতির সংগে এদের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে জড়িত। এদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য খুবই কম। ধনী নেই বললেই চলে; বেশির ভাগ লোকই নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। এ ছাড়াও বাংলায় প্রাচীন অনার্যদের বংশধর 'আদিবাসী' জাতিরা রয়েছে প্রধানত চাষী ও মজুর হিসাবে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত হলেও এদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থেকে বোঝা যায় যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে এরা বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪১ সালে শিক্ষার অবস্থা ছিল—শতকরা ১৫ জন। উন্নতি অবশ্য কিছু হয়েছে কয়েক বছরে। কিন্তু বিভাগের পর পূর্ব বংগ নেমে গেছে পশ্চিম বংগের নীচে পূর্ববংগবাসী হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে। স্ত্রীশিক্ষার অবস্থাও একই। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বিশেষত উচ্চ শিক্ষা, হিন্দুর মধ্যেই আবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে মুসলিম সমাজের গোঁড়ামি দূর করা একান্ত প্রয়োজন।

বংগভংগে শিক্ষার সংকট উপস্থিত হয়েছে। পূর্ব বংগে শিক্ষার প্রসার কমেছে। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের অধিকাংশই হিন্দু, ছাত্রেরাও বিশেষত উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে। এঁদের স্থানান্তরের ফলে বহু কষ্টে গড়া

অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বংগে নতুন শিক্ষালয় গজিয়ে উঠছে, কিন্তু এখানেও উদ্বাস্তু-সমস্যায় এবং সুব্যবস্থার অভাবে শিক্ষারীতি বিপন্ন হয়েছে। যুগোপযোগী বিজ্ঞানচর্চার চাহিদা মেটানোও কঠিন। কিন্তু যে ব্যবস্থা পূর্ব ও পশ্চিমে প্রথমেই হওয়া উচিত তা হচ্ছে নিরক্ষর জনসমাজের মধ্যে পরিকল্পনানুযায়ী আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ; কারণ, লোকশিক্ষার ভিত্তিতেই সুস্থ রাষ্ট্রীয় জীবন সম্ভব। শিক্ষাও এমন হওয়া দরকার যাতে এর মধ্য দিয়ে কালোপযোগী চিন্তা গ্রহণ করবার ক্ষমতা জন্মায় এবং যা ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী হয়।

লোকশিক্ষার সংগে ম্রিয়মাণ লোকসংস্কৃতিকেও বাঁচিয়ে তুলতে হবে। দেড় শো বছর ধরে এই সংস্কৃতি ধ্বংসের পথে চলেছে। এর বিভিন্ন রূপের ভেতর দিয়ে আধুনিক ভাবধারা এবং সুস্থ সমাজচেতনা গড়ে তোলা যায় ; গান ও অভিনয়, নৃত্য ও শিল্প নব সংস্কৃতির মাধ্যম হতে পারে। এ ছাড়া বেতার ও ছায়াচিত্র ইত্যাদি বহু উপায়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেওয়া যায় যদি আমাদের শাসনকর্তারা তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হন।

'পশ্চাতে টানিছে'

বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ শ্রেণীই উচ্চ বর্ণের। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরাই নেতৃস্থানীয় যদিও সংখ্যায় এরা নিম্ন বর্ণের চেয়ে অনেক কম। জাতিভেদের হাজার নিয়মে উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণ ও এমন কি অস্পৃশ্যদের মধ্যেও বহু শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। প্রাচীন কালে জাতিভেদপ্রথার কোনো অর্থ ছিল কি-না তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তবে বর্তমান জীবনে এই রীতি শুধু অমানুষিক নয়, বহু সমস্যার জন্যও দায়ী। মধ্য যুগে নানা কারণে জাতিভেদ কঠিন হয়ে ওঠে, কিন্তু এই বিধিনিষেধ বাংলার

মাটির স্বভাববিরুদ্ধ বলেই বোধ হয় এর উৎপাতে বাংলার সর্বনাশ হতে চলেছে। তথাকথিত উচ্চ বর্ণেরা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে; কিন্তু নিম্ন বর্ণেরা শুধু বর্ধিষ্ণু নয়, এরা কর্মঠ ও একটা জাতির অপরিহার্য জীবিকার সাধক। উচ্চ বর্ণের সামাজিক অত্যাচারে ও কুৎসিত অস্পৃশ্যতার উৎপাতে যুগে যুগে এরা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। এই প্রথা দূর করতেই হবে।

যে সমাজে নারীশক্তি নিপীড়িত বিভ্রান্ত ও অচেতন সে সমাজের ভবিষ্যৎ নেই বললেই চলে। এতটা জনশক্তি রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতির জন্য নিযুক্ত হলে সারা দেশের অবস্থাই বদলে যাবে। এ দিকে কিছু অগ্রগতি দেখা গেছে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে, কিন্তু মুসলিম নারী-সমাজে অবরোধপ্রথা ও অশিক্ষা আজো প্রবল। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের কারাগার ভেঙে স্বাস্থ্যে ও শিক্ষায়, চিন্তা ও কর্মঠতায় বাঙালী মেয়েকে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে হবে।

অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার অধোগতি হয়েছে কয়েকটা বিশেষ কারণে: (১) বাংলার লোকসংখ্যা সব চেয়ে বেশি কিন্তু কৃষিভূমির পরিমাণ সেই হিসাবে কম। একাধিক কারণে কৃষির দ্রুত অবনতি ঘটেছে, গোশক্তিরও। (২) বাঙালীর খাদ্য নিকৃষ্ট—এতে পরিপোষণশক্তির অভাব স্পষ্ট। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাধির অত্যাচারে জীবনীশক্তিরও হ্রাস ঘটেছে। প্রাকৃতিক কারণেও বাঙালীর দৈহিক শক্তি ও সহনশীলতা সাধারণত কম। (৩) শিল্পী-শ্রমিক-ব্যবসায়ীদলের বৃদ্ধি নেই; তাই অর্থনৈতিক ব্যাপারে অবাঙালীর আধিপত্য বাংলার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। (৪) মেস্টন্-বাঁটোয়ারায় বাংলার তদানীন্তন ৫ কোটি লোকের জন্য কেন্দ্র থেকে ধার্য অর্থ ছিল ১১ কোটি টাকা আর বোম্বাইয়ের ২ কোটি লোকের জন্য ছিল ১৫ কোটি টাকা। ফলে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়েছে আর আয় কমেছে, উন্নতির কোনো ব্যবস্থাই হয়নি। (৫) ১৯৩৯র

মহাযুদ্ধে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাই হয়েছে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। সামরিক কেন্দ্র হিসাবে ও জাপানী আক্রমণের আতংকে বাংলার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। যুদ্ধোত্তর চোরা কারবারের পৈশাচিকতাও যুক্ত হয়েছে তার সংগে। (৬) তার পর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' আর সাম্প্রদায়িক দাংগা। এ দুটি সর্বনাশের তো তুলনা নেই।

দিগন্ত

ইংরেজের রাজনৈতিক বসতি বাংলাতেই প্রথম। যাবার আগে তাই সে পরম আক্রোশে তার সাধের বাসা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

কিন্তু এই ইংরেজ-পরিত্যক্ত ভারতের অভিশপ্ত বাংলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের বাংলা। ওয়াজেদ আলি বলেন :

> আমাদের সামাজিক জীবন মধ্যযুগীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অতীতমুখী ; আর আমাদের রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষাগত আদর্শ হচ্ছে আধুনিক যুগের এবং ভবিষ্যমুখী।.. আমরা জীবন্ত এবং মৃত চিন্তার মধ্যে প্রভেদ করতে শিখিনি।

মৃত চিন্তার পরিবর্তে জীবন্ত চিন্তার সাধনাই আনবে আমাদের ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিগন্ত।

৭ : 'বন্ধ কোরোনা পাখা'

আর্যাবর্ত আর উত্তরাপথ, দাক্ষিণাত্য আর পশ্চিম ভারত—এই গণ্ডীর ভেতরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুরে গেছে প্রাচীন ইতিহাসের অগ্নিচক্র। কিন্তু অন্ধকারে ঢাকা পূর্ব ভারতে ও বাংলায় দিনে দিনে তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়েছে অলক্ষ্য ঐতিহাসিক শক্তি। এই রহস্যময় তমসাচ্ছন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা বাঙালী। ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে বার বার মেঘ জমেছে; বিদেশী অভিযানের ঝড় এসে থেমে গেছে উন্নাসিক আর্যের অস্পৃশ্য বাংলার দ্বারে। নেহ্‌রুও তাই 'ভারত-আবিষ্কার' গ্রন্থে তাঁর যুক্ত প্রদেশ সম্বন্ধে বার বার উচ্ছ্বসিত হয়েছেন :

> ......আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশ—হিন্দুস্থানের হৃদয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতার কেন্দ্র .....
>
> যুক্ত প্রদেশ ... ভারতের প্রতীক। এটি হিন্দু কৃষ্টি এবং আফগান ও মোগল যুগের পারসিক সংস্কৃতির কেন্দ্র, আর তাই দুয়ের মিলন এখানে হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগে। ভারতের অন্যান্য জায়গার তুলনায় প্রাদেশিকতা এখানে কম। বহুদিন থেকেই এ প্রদেশ......ভারতের হৃদয়।

কিন্তু নেহ্‌রুর গ্রন্থে 'ভারতের সন্ধানে' অধ্যায়টিতে তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি রয়েছে যে বাংলা দেশ ছাড়া আর সর্বত্রই তিনি ভারতের সন্ধান করেছেন :

> বাংলার গ্রাম্যাঞ্চল ছাড়া......আমি প্রত্যেক প্রদেশেই ভ্রমণ করেছি এবং সুদূর গ্রামের ভেতরেও গিয়েছি।

আঠারো শতকের শেষার্ধে হল পটপরিবর্তন : নতুন ঐতিহাসিক শক্তির আবির্ভাব ঘটল এবার উত্তর-পশ্চিমে নয়, পূর্ব ভারতেও বাংলায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আধুনিক ভারত জন্ম নিল বাংলা দেশে : বদলে গেল ইতিহাসের আলোক-ভংগী। কিন্তু নতুন সভ্যতার আভাস এসেছে অজস্র গ্লানির ভেতর দিয়ে, আর সেই গ্লানিতে আজ বাঙালী অবসন্ন।

হাহাকার উঠেছে যে বাঙালী ধ্বংসোন্মুখ — বিশেষত বাঙালী হিন্দু। ধ্বংসের লক্ষণ দেখা গেছে তার আর্থিক দুরবস্থায়, তার অর্থনৈতিক পরাজয়ে, তার স্বাস্থ্যের অবনতিতে, তার রাষ্ট্রীয় জীবনের জটিলতায়, তার সমাজব্যবস্থায়।

'হে মুগ্ধা জননী' ?

কিন্তু চিন্তাশক্তি ও মনীষার অভাব নেই বাঙালীর। আজ চরম পরীক্ষার দিনে তাকে নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে। চাই খাঁটি আদর্শবাদ, চাই দুর্বার সংগঠনপ্রতিভা। সমূহ সর্বনাশকে প্রতিরোধ করে নব জীবনের খাতে ঘুরিয়ে দিতে হবে সমাজশক্তিকে। দেখতে হবে সমাজের সব স্তরেই যেন আদর্শবাদ ছড়িয়ে পড়ে, সব স্তরেই যেন সাড়া পড়ে যায়। পরিণত সমাজচেতনা চাই ; হাজারে একজনের স্বাচ্ছন্দ্য জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। বিরোধ ও অবিচার, কুৎসিত সংস্কার ও উচ্ছৃংখলতা জাতিকে দুর্বল করে অবশেষে অপমৃত্যু আনে। আত্মঘাতী সমাজব্যবস্থার পরিসমাপ্তি আনতেই হবে।

শাস্ত্রে আছে যে অর্থই অনর্থ। দেশের অর্থনৈতিক দায়িত্ব তাই ব্যক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রের হাতে যত থাকে ততই ভাল। তাতে সংগঠন ও পরিকল্পনার দ্বারা সর্বাংগীন উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে। বাঙালীকে ব্যক্তিগত ভাবে যদি নামতে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যে তা হলে

সে ব্যবসা হবে সমাজের শুভবুদ্ধি নিয়ে, শোষণ ও স্বার্থের জন্য নয়। জৈমিনি বলেছেন যে জমি তার যে চাষ করে। এই মানবিক সত্য আজ মেনে নিতেই হবে। বাংলার জমিদারী প্রথার কোনো অর্থ ছিল কি-না তা নিয়ে আলোচনা করবার দরকার নেই, কিন্তু বর্তমানে একটা দূষিত ক্ষতের মতোই এ প্রথা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এর অর্থনৈতিক কুফল এত মারাত্মক যে শ্রেণীগত স্বার্থ ত্যাগ করে এ প্রথাকে আজ দূর করতেই হবে।

চাষীকে বাঁচাতে হবে, মজুরকে বাঁচাতে হবে। দেশের হাজার হাজার লোক যে তিলে তিলে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে একটা নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থার ফলে এ কথা যদি আজ আমরা না বুঝি তা হলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস এর চরম প্রতিশোধ নেবে এক অভাবনীয় ধ্বংসের দ্বারা। তথাকথিত মধ্যবিত্ত আজ আর মধ্যবিত্ত নেই, নেমে চলেছে দুর্বার গতিতে :

বিধাতার রুদ্র রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান ; .....

সেই নিম্নে নেমে এস নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ,
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

—রবীন্দ্রনাথ

বেল্‌শাজারের জীবনে দেয়ালের গায়ে লেখা শুরু হয়েছে, চার দিক ঘিরে চলেছে ওঠা-পড়ার বিপুল ঐতিহাসিক আয়োজন। শ্রেণীদম্ভ ও শ্রেণীসংঘর্ষ ছেড়ে আজ বাঙালীকে সংঘবদ্ধ চেষ্টায় নতুন সমাজ গড়তেই হবে। মানুষের প্রগতিশীল মন ও জীবন পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তন করে। এই ভাবেই ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচিত হয়।

বাঙালীর জীবনে বিপর্যয় যে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই আজ প্রাচীন এথেনীয়দের সংগে তুলনা চলেছে। সংস্কৃতিবাহী বাঙালী জাতি কি ব্যাধিপ্রপীড়িত হয়ে সামাজিক দুর্বলতার প্রহরে অনুন্নত বর্বর শ্রেণীর আঘাতে এথেনীয়দের মতোই লুপ্ত হয়ে যাবে? এই আতংকের কি কোনো ভিত্তি আছে?

যুগে যুগে বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঐতিহাসিক বিপ্লব বাঙালীকে ধ্বংস করতে পারেনি। সাময়িক অধোগতি সত্ত্বেও চিন্তাধারায় ও নতুনকে গ্রহণ করার শক্তিতে বাঙালী আজো তো প্রাণধর্মের লক্ষণ দেখিয়ে চলেছে। পূর্বে ও পশ্চিমে নব জাগৃতির ইসারা তো মিলছে গণচেতনার আভাসে। অতীতে এবং অদূর অতীতেই এক শো দেড় শো বছরের মধ্যেই বাংলা অন্তত দেড় শো মনীষীর জন্ম দিয়েছে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এ সবই তো প্রাণবন্ত জাতির লক্ষণ।

তা হলে কি অবনতি হয়নি, অপমৃত্যুর সম্ভাবনা নেই? এর উত্তর হচ্ছে এই যে অবনতি সাময়িক মাত্র। আর এই অবনতি ও তার সংগে একটি তীব্র সচেতন মন বাঙালীকে নিয়ে চলেছে নব যুগের উদয়াচলের পথে। এ বিপর্যয় অপমৃত্যু নয়, এ শুধু এক অপরিমেয় দিগন্তের পূর্বাভাস। রবীন্দ্রনাথ পরিত্রাণকর্তার কথা বলেছেন, মহামানবকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু মহামানব বা পরিত্রাণকর্তা আসবেন কি-না জানি না, তবে বুদ্ধি অনুভূতি ও কল্পনা দিয়ে বুঝি যে পরিত্রাণ আসবেই। এ যুগ নেতার যুগ নয়, কর্মীর যুগ। তাই হয়তো সাধারণ অর্থে কোনো বিশিষ্ট নেতা নেই বাংলায়। কিন্তু বহু অখ্যাত অজ্ঞাত লোক গভীর আদর্শবাদ নিয়ে তিলে তিলে নিঃস্বার্থ ভাবে খেটে চলেছে তলায় তলায়। তাদের সাধনার যৌথ শক্তি নিশ্চয় একদিন আসমুদ্রহিমাচল

বাংলাকে সমূলে পরিবর্তন করে দেবে। সংকটের চরম প্রহরে নেতৃত্ব আপনিই আসে।

এক একটা যুগে এক একটা দেশের ওপর আসে ঐতিহাসিক দায়িত্বের ভার। আজ হয়তো সেই দায়িত্ব এসেছে সারা প্রাচ্যের নিপীড়িত জাতিসমূহের ওপর, ভারতে ও বাংলায়। ইংরেজী আমলের বাংলা ভারতকে এক পথ দেখিয়েছিল; আজ নতুন পথের প্রারম্ভেও বিংশ শতাব্দীর বাঙালী হবে অগ্রগামী। সেদিন ছিল ভারতের দায়িত্ব তার ওপর; আজ সর্বহারা হয়ে সে হয়তো হতে চলেছে এক নতুন পৃথিবীর দায়িত্বের অংশীদার। এথেনীয়রা নতুনকে অস্বীকার করেছিল, তাই তারা মরে গেছে; বাঙালী নতুনকে গ্রহণ করে বেঁচে থাকবে।

বাঙালিত্ব মানে সারা পৃথিবীকে অস্বীকার করে কূয়ো খুঁড়ে তার মধ্যে ব্যাঙ্‌ হয়ে বসে থাকা নয়, রক্ত ও ঐতিহ্যের মূল ধারা বজায় রেখে নিঃশংক মনে কালোপযোগী পরিবর্তনের পথে অগ্রগতি। গোষ্ঠীসর্বস্ব সমাজ আন্তর্জাতিকতার দিকে চলেছে। প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতা এমন কি অন্ধ জাতীয়তাও হবে যুগধর্মবিরোধী। স্বাতন্ত্র্য থাকবে, বৈচিত্র্য থাকবে। কিন্তু তা যেন সমন্বয়বিরোধী না হয়, স্বার্থ যেন সুবুদ্ধিকে গ্রাস না করে।

আগামী পরিবর্তনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যে সমাজের কাছে আমরা পেয়েছি অমানুষিক অপমান আর অত্যাচার তাঁর দিন শেষ হবেই।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।......

তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের সমাজব্যবস্থা যে নিঃস্ব রিক্ত জীর্ণ ও মুমূর্ষ তার স্বীকৃতি মেলে চাষী-মজুরের অশিক্ষা আর শোচনীয় দারিদ্র্যে, মধ্যবিত্তের কুশিক্ষা আর নৈরাশ্যে, ধনিকের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে। খণ্ডিত বংগ যুক্ত বংগ ও বৃহৎ বংগ — এ সবেরই ঐতিহাসিক কারণ ও অর্থ রয়েছে; কিন্তু যুগব্যাপী প্রশ্নের উত্তর এদের কোনোটাতেই মিলবে না। বহু পুরাতন ইমারতে ঘুণ ধরেছে, ধ্বসে পড়ছে; চূণকাম-করা কবরের নীচে শুধু হাড়। মানুষের নীড়সম্ভোগী মন ধীরে ধীরে শবসম্ভোগী সমাজের সৃষ্টি করে, পরিবর্তনকে ভয় পায়; কিন্তু প্রতিক্রিয়ার আঘাতে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসেই। সভ্যতার নির্মোক, সাপের খোলস বদলাবার দিন আসেই। ফিনিক্স্ পাখী নিজেরই চিতাভস্মে নব কলেবর ধারণ করে।

সর্বনাশের প্রহরেই জাতির গভীরতম আধ্যাত্মিক শক্তির জাগরণ হয়, নতুন পন্থা খুঁজে ফেরে মানুষের চিন্তিত আলোড়িত সমাজবুদ্ধি। জাতির জীবনীশক্তির উৎস এইখানেই। ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্ বলেছেন: 'By the soul only nations shall be great'—সেই আত্মার শক্তি, সেই ধর্ম হিন্দু নয়, ইসলাম নয়, সনাতন মানবধর্ম। আর এই মানবধর্মই হচ্ছে আজ সারা পৃথিবীর যুগধর্ম। খাঁটি বাঙালিত্ব এই কালধর্মের বিরোধী নয়। তা হলে কিসের ভয়? বাঙালীর ভয়, বাঙালীর বিপদ সেই দিন আসবে যে দিন সে তার সনাতন মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে।

সাত কোটি লোকের মানসিক অখণ্ডতার শক্তি সাময়িক বিপর্যয়ে

ব্যর্থ নির্মূল হয়ে যায় না, পথের সন্ধান মেলেই। শুধু মানুষের অপরাজেয় মনে বিশ্বাস রাখো। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙালীকে হতে হবে নতুন সভ্যতার অগ্রদূত : ~~ছিন্ন সতীদেহ যেখানে যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেই জেগে উঠেছে পীঠস্থান~~। আদর্শবাদের দৃঢ়তা নিয়ে বাঙালী যদি নিঃশেষও হয়ে যায় তা হলে তার প্রতিটি রক্তবিন্দু নতুন মানুষ নতুন জাতির মধ্যে আবার জীবন পাবে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের বাণী :

> মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

গ্রন্থনির্দেশিকা

গ্রন্থনির্দেশিকাটি পণ্ডিতদের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের উদ্দেশে। তারকাচিহ্নিত বইগুলির কাছে বর্তমান রচনাটি বিশেষ ঋণী।

*	আলি ওয়াজেদ	:	ভবিষ্যতের বাঙালী।
	গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র	:	গ্রন্থাবলী।
	গোস্বামী, নিত্যানন্দ	:	বাংলা সাহিত্যের কথা।
*	ঘোষ, বিনয়	:	বাংলার নবজাগৃতি।
*	চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার	:	জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য।
	ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ	:	বাংলার ব্রত।
*	ঠাকুর, টেকচাঁদ	:	আলালের ঘরের দুলাল।
*	দত্ত, রজনী পাম্	:	'ইণ্ডিয়া টু-ডে'।
*	বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন	:	মধ্যযুগের বাংলা।
*	বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ	:	সংবাদপত্রে সেকালের কথা।
	বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস	:	বাংলার ইতিহাস।
	বসু, মীনেন্দ্রনাথ	:	বাঙালীর পরিচয়।
	বসু, শান্তিপ্রিয়	:	বাংলার চাষী।
	ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ	:	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।
	ভট্টাচার্য, চপলাকান্ত	:	কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা।
*	মজুমদার, রমেশচন্দ্র	:	বাংলা দেশের ইতিহাস।
*	মার্কস্, কার্ল্	:	'আর্টিকল্স্ অন্ ইণ্ডিয়া'।
	মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার	:	বংগপরিচয়।
*	মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল	:	বাংলা ও বাঙালী।
*	" "	:	বিশাল বাংলা।
	শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ	:	প্রাচীন বাংলার গৌরব।
	শেঠ, হরিহর	:	পুরাতনী।
	সরকার, যদুনাথ	:	'হিস্ট্রি অফ্ বেংগল্'।
*	সিংহ, কালীপ্রসন্ন	:	হুতোম প্যাঁচার নক্শা।
*	সেন, অমিত	:	'নোট্স্ অন্ বেংগল্ রেনেসাঁস'।
*	সেন, ক্ষিতিমোহন	:	বাংলার সাধনা।
*	সেন, দীনেশচন্দ্র	:	বৃহৎ বংগ।
*	সেন, সুকুমার	:	প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী।
*	" "	:	মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।
*	হালদার, গোপাল	:	বাঙালী সংস্কৃতির রূপ।

<u>ইংরেজী আমলের আগে বাংলা</u>
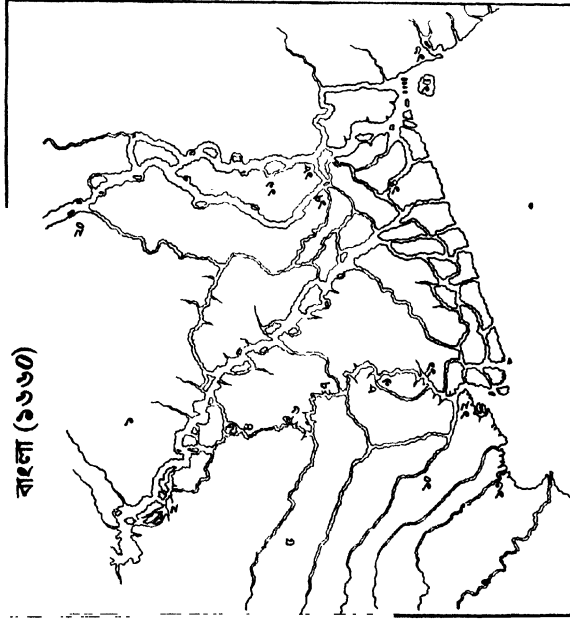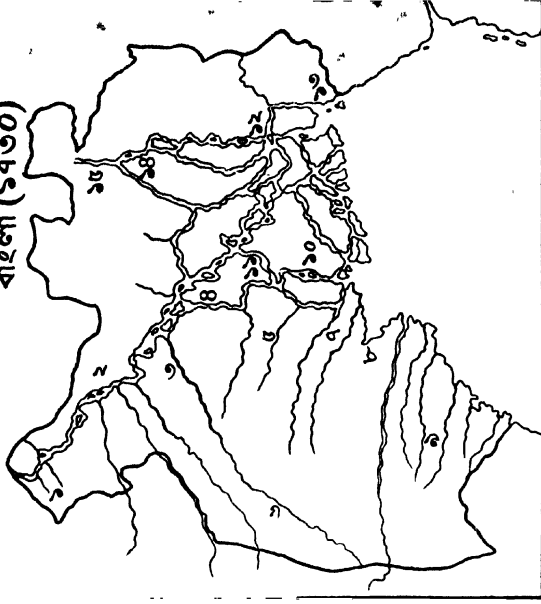
১৬৬০ : আওরংজেবের রাজত্বে মীরজুমলার শাসনাধীনে বাংলার মানচিত্র ভ্যান্ ডেন্ ব্রুকের আঁকা। ১ মালদহ ২ রাজমহল ৩ মুর্শিদাবাদ ৪ কাশিমবাজার ৫ বক্রেশ্বর ৬ পলাশী ৭ নদীয়া ৮ সাতগাঁ ৯ হুগলি ১০ মেদিনীপুর ১১ কলকাতা ১২ তমলুক ১৩ বালেশ্বর ১৪ বাকলা ১৫ সন্দ্বীপ ১৬ চট্টগ্রাম ১৭ ঢাকা ১৮ সোনার গাঁ ১৯ শ্রীহট্ট ২০ বারিন্তলা।

১৭৩০ : মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বে সুজাউদ্দীনের শাসনাধীনে বাংলার মানচিত্র আইজ্যাক্ টিরিয়ানের আঁকা। ১ পাটেনা ২ মুংগের ৩ রাজমহল ৪ [illegible] ৫ বর্ধমান ৬ জৌনপুর ৭ মেদিনীপুর ৮ বালেশ্বর ৯ কটক ১০ হুগলি ১১ নদীয়া ১২ ঢাকা ১৩ চট্টগ্রাম ১৪ গোড়াঘাট ১৫ পটন।

বিভক্ত বংগ—১৯০৫

বাংলা (১৯০৫)

	বর্গ মাইল	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
(ক) বাংলা	১,১৫,৮১৯	৫,০৭,২২,০৬৯	৪,২৫,৪০,৩৫৯	৯২,০৮,১৯৯
পশ্চিম বংগ	৩১,৪৫১	১,৭২,৩৩,১০৪	হিন্দুপ্রধান	...
বিহার	৪৩,৫২৪	২,৩৬,০৬,৩৯২	"	...
ছোটনাগপুর	২৭,১০১	৪৯,০০,৪২৯	"	...
উড়িষ্যা	১৩,৭৪৩	৪৯,৮১,১৪২	"	...
কুচবিহার	১,৩১৮	৫,৬৬,৯৭৪	"	...
কলকাতা	৩৪	১১,৯০,২৪৭	"	...
হাওড়া	১০	১,৫৭,৫৯৪	"	...
(খ) পূর্ববংগ-আসাম	৯৭,৫১০	৩,০৯,৬১,৪৫৯	১,১৬,৩৯,৪৯১	১,৭৮,৬৮,৪৫২
পূর্ব বংগ	৪৫,৯৫১	২,৫৬,৫৬,৩৪৯	...	মুসলিমপ্রধান
আসাম	৫১,৫৫৯	৫১,০৫,১১০	হিন্দুপ্রধান	...
মণিপুর	৮,৬২০	২,৮৪,৪৬৫	"	...
ত্রিপুরা	৪,১১৬	১,৭৩,৩২৫	"	...
ঢাকা		৮৯,৭৩৩	"	...

জাতীয়তা আন্দোলনের যুগে লর্ড কার্জনের দ্বারা বাংলা ভাগ। উদ্দেশ্য: (১) পূর্ববংগ-ও-আসাম প্রদেশে জাতীয়তাবাদ রোধ ও সাম্প্রদায়িক বিরোধের ব্যবস্থা; (২) বিহার-ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা-পশ্চিমবংগ প্রদেশে অনুন্নত অবাঙালীকে সংখ্যাগুরু করা ও জাতীয়তাবাদ দমন করা। ফল: বাঙালীর জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে সারা ভারতের রাজনৈতিক নব জাগৃতি। পূর্ব বংগে ছিল বাংলার ১৫টি জেলা, পশ্চিম বংগে ১৩টি। ভারতে বাংলাভাষীর সংখ্যা: সাড়ে চার কোটি।

সীমানা: (ক) বিহার-ছোটনাগপুর-উড়িষ্যা-পশ্চিমবংগের নতুন 'বাংলা'—১ দার্জিলিং ২ বক্সার ৩ পালামৌ ৪ স্থানপুর ৫ পুরী ৬ বালেশ্বর ৭ মোরেলগঞ্জ ৮ কুষ্টিয়া ৯ রাজমহল ১০ কিশনগঞ্জ। (খ) পূর্ববংগ-আসাম—১১ বাগ্রাকোট ১২ জলপাইগুড়ি ১৩ রামপুর-বোয়ালিয়া ১৪ পিরোজপুর ১৫ টেক্নাফ্ ১৬ শিলচর ১৭ শিলেট ১৮ শিলং ১৯ ডিব্রুগড় ২০ ধুবড়ি। ক-কুচবিহার; ত্রি-ত্রিপুরা। সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি: আদমসুমারি (১৯০১)

যুক্ত বংগ—১৯১২

সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি : আদমসুমারি (১৯১১)। ১৯০৫র তীব্র রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় পূর্ব ও পশ্চিম বংগ আবার যুক্ত হয়। কিন্তু অযৌক্তিক ভাবে কয়েকটি বাংলাভাষী অঞ্চল বিহার ও আসামের সংগে জুড়ে দেওয়া হয়। বিহারের তদানীন্তন অনেক নেতাই তখন এই অবিচারের প্রতিবাদ করেন, যদিও দুঃখ ও আশ্চর্যের কথা এই যে স্বাধীনতার পর কংগ্রেসী আমলে বাঙালীর এই ন্যায্য দাবি বিহারীদের দ্বারা শুধু যে উপেক্ষিত হচ্ছে তা নয় নানা রকম অবিচার ও এমন কি দাংগা চালাতেও কোনো দ্বিধা নেই। সীমানা : ১ দাজ্জিলিং ২ খরবা ৩ নলহাটি ৪ রামপুরহাট ৫ সীতারামপুর ৬ দিঘা ৭ টেক্‌নাফ্‌ ৮ রাঙামাটি ত্রি—ত্রিপুরা রাজ্য ৯ সুসং দুর্গাপুর কু—কুচবিহার রাজ্য ১০ দলসিং পাড়া। প্রাদেশিক রূপ মোটামুটি এই ভাবে ১৯৪৭ পর্যন্ত চলে ; তার পর আসে র‍্যাডক্লিফের বাংলাভাগ। বাংলায় ছিল ৫টি বিভাগ ও ২৮টি জেলা (কলকাতা নিয়ে)। সারা ভারতে বাংলাভাষী লোকসংখ্যা ছিল ৪,৮৫,৫০,০০০।

	আয়তন : বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
বাংলা	৭৮,৬৯৯	৪,৫৪,৮৩,০৭৭	২,০৩,৮০,৭২০	২,৩৯,৮৯,৭১৯
দেশীয় রাজ্য	৫,৪৩৪	৮,২২,৫৬৫	৫,৬৭,৬৩৭	২,৪৭,৫০৯
কলকাতা	৩৪	১০,৪৩,৩০৭	হিন্দুপ্রধান	...
হাওড়া	১০	১,৭৯,০০৬	"	...
ঢাকা	...	১,০৮,৫৫১	"	...

ভারতের স্বাধীনতার সময়ে লর্ড্ মাউন্ট্ব্যাটেনের পরিকল্পনায় ও র‍্যাড্ক্লিফের বিচারে বাংলা-ভাগ। বৈশিষ্ট্য : (১) প্রাকৃতিক সীমানার অভাব ; (২) সাম্প্রদায়িক সমস্যার অসমাধান ; (৩) পশ্চিম বংগ দ্বিধাবিভক্ত। উদ্দেশ্য : (১) সাম্প্রদায়িক বিরোধের সম্ভাবনা বজায় ; (২) সীমানা বিরোধ ; (৩) শাসনকার্য ও উন্নতি-পরিকল্পনার বাধা ; (৪) প্রগতিশীল বাঙালী খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ; (৫) বাঙালীর বহু সমস্যায় ও প্রাদেশিক বিরোধে ভারতের ক্ষতি। ফল : (১) বর্তমানে বাঙালীর অখণ্ডতালোপ ও সর্বাংগীন বিপর্যয় ; (২) দুর্গতির মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা।

বাংলা (১৯৪৭)

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
(ক) পশ্চিম বংগ	২৮,২১৫	২,১১ ৯৬,৪৫৩	৬৭·৬১	২৫·০১
কুচবিহার	১,৩১৮	৬,৪০,৮৪২	হিন্দুপ্রধান	...
ত্রিপুরা	৪,১১৬	৫,১৩,০১০	"	...
কলকাতা	৩৪	২৮,১৮,৪৪৫	,,	...
হাওড়া	১০	৩,৭৯,২৯২	,,	...
(খ) পূর্ব বংগ	৫৩,৯০৯	৪,১৯ ৪৯,৭১০	২৮·৫	৭১
ঢাকা	...	২,১৩,২১৮	হিন্দুপ্রধান (১৯৪১)	মুসলমানপ্রধান (১৯৪৭)

বংগবিভাগের জন্য নানা কারণে সংখ্যাবিভ্রাট ঘটেছে। ১৯৪১ সালে ভারতে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি। পশ্চিম বংগের আয়তন সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ রয়েছে ; সীমানা নিয়েও বিতর্ক চলেছে। কুচবিহার অযৌক্তিক ভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হয়েছে। ত্রিপুরার সংগে পশ্চিম বংগের যোগ না থাকায় আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু গোয়ালপাড়া-কুচবিহার ও বিহার-উড়িষ্যার খানিকটা অংশ নিয়ে নব পশ্চিম বংগ গঠিত হতে পারে।

(ক) পশ্চিম বংগ—সমগ্র বর্ধমান বিভাগ (৬টি জেলা), ২৪ পরগণা ও কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং, নদীয়া (প্রায় অর্ধেক), যশোর (আয়তনের ১১°/.), জলপাইগুড়ি (৭৮°/.), দিনাজপুর (৩৫°.); মালদহ (৭০ ভাগ); (খ) পূর্ব বংগ—সমগ্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ (৮টি জেলা), রংপুর, বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, খুলনা এবং নদীয়া-যশোর-জলপাইগুড়ি-দিনাজপুর-মালদহ-শিলেটের অল্প-বিস্তর অংশ। সীমানা : ১ হিংগুলগঞ্জ ২ কালিগঞ্জ ৩ বনগাঁ ৪ অমৃতবাজার ৫ তেহাটা ৬ মেহেরপুর ৭ লালগোলা ৮ গোদাগাড়ি ৯ গৌড় ১০ পার্বতীপুর ১১ হিলি ১২ ঘোড়াঘাট ১৩ বিন্দোল ১৪ দিনাজপুর ১৫ হলদিবাড়ী ১৬ পচাগড় ১৭ কুড়িগ্রাম ১৮ বাহাদুরাবাদ ঘাট ১৯ সুসং দুর্গাপুর ২০ জয়ন্তিয়াপুর ২১ শিলেট ২২ কুলাউড়া ২৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৪ কুমিল্লা ২৫ চট্টগ্রাম কু-কুচবিহার, ত্রি-ত্রিপুরা। সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি : আদমসুমারি (১৯৪১)।

সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তি : আদমসুমারি (১৯৩১ ও ১৯৪১)। মূলত ভাষা ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এই রূপ দর্শিত হল। ১৯৪১র আদমসুমারিতে ভাষাভিত্তি উপেক্ষিত হওয়ায় কয়েকটি গণনা অনুমানিক।

আয়তনবৃদ্ধি		আয়তন : বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	লোকসংখ্যাবৃদ্ধি	বাংলাভাষী (শতকরা)
[illegible]	পূর্ব পাকিস্তান	৫৩,৯০৯	৪,১৯,৪৯,৭১০	২৮,৩৯,৬৩৮	৯৭
	পূর্ব বংগ	৪৯,২২৭	৩,৯১,১০,০৭২	...	...
	শ্রীহট্ট (অংশ)	৪,৬৮২	২৮,৩৯,৬৩৮	...	...
[illegible]	অবশিষ্ট বংগ	৫৩,৬৭১	২,৮৮,৭১,৭৩৩	৭৬,৭৬,২৮০	৮৩
	পশ্চিম বংগ	২৮,২১৫	২,১১,৯৬,৪৫৩	...	৯১
[illegible]	বিহার-অঞ্চল	...	...	৪৬,০০,০০০	...
	পূর্ণিয়া (অংশ)	২,৫০০	১২,০০,০০০	...	
	সাঁওতাল পরগণা (")	২,৭০০	১১,২৫,০০০	...	...
	মানভুম (")	৩,৫০০	১৭,৭৫,০০০	...	...
	ধলভূম (")	১,০০০	৫,০০,০০০	...	...
৮০০	উড়িষ্যা-অঞ্চল	...	...	১,৫০,০০০	..
	বালেশ্বর (")	৮০০	১,৫০,০০০	...	...
৬,৮৫৭	আসাম-অঞ্চল	...	...	১৬,৫০,৮৬৮	...
	গোয়ালপাড়া (")	৩,০০০	৭,৫০,০০০	...	...
	কাছাড় (")	৩,০০০	৫,১৫,০০০	...	...
	শ্রীহট্ট (")	৮৫৭	৩,৮৫,৮৬৮	...	...
৫,৪৩৪	দেশীয় রাজ্য	...	...	১১,৫৩,৮৯২	..
	কুচবিহার	১,৩১৮	৬,৪০,৮৮২	...	...
	ত্রিপুরা	৪,১১৬	৫,১৩,০১০	...	...
২,৮১৮	সিকিম	২,৮১৮	...	১,২১,৫২০	...
৩০,২৯১	আসল বাংলা	১,০৭,৭৩১	৭,০৮,২২,৪৪৩	১,০৫,১২,৯১৮	৯১
	অবিভক্ত বাংলা	৭৭,৪৪২	৬,০৩,০৬,৫২৫	...	৯৩

সীমানা : ১ কিশনগঞ্জ ২ রাজমহল ৩ পাকুরিয়া ৪ ... ৫ জামসেদপুর ৬ বালেশ্বর ৭ আগড়তলা ৮ শিলচর ৯ গো... ১০ কুচবিহার।